বাঙলার তন্ত্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা : বিমলেন্দু চক্রবর্তী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪৯

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০/বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

স্মৃচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়

ভূমিকা

বাঙালী মাত্রেই শাক্ত অথবা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মের বীজ শাক্ত ধর্মে বা তন্ত্রাচারে। শুধু তাই নয় ভারতীয় ধর্ম সাধনার মূল কাণ্ড তন্ত্র নির্ভর। বাঙালীর জীবনধারার পরিক্রমার পথেই তন্ত্রের উদ্ভব। তন্ত্র প্রধান অঞ্চল বলতে বোঝায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রাগজ্যোতিষপুর। বৌদ্ধ তন্ত্রের আবির্ভাব বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপে আজ যা বাখরগঞ্জ নামে পরিচিত। তন্ত্র সম্পর্কে বাঙালীর ধারণা শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, তন্ত্র অসামাজিক এবং পঞ্চ ম-কার সাধনার মাধ্যমে ব্যভিচারের মাধ্যম! সত্য কথা এই তন্ত্র সম্পর্কে এসব ধারণা অজ্ঞানতা-প্রসূতার পথ ধরে গড়ে উঠেছে।

বর্তমান বাঙালীর ধারণায় তন্ত্র জটিল অনাচারণীয় ধর্ম। এসব ধারণা যাদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে তাদের কাছে তন্ত্র একমাত্র ভৈরব ভৈরবীর গুহ্যাচারের ধর্ম। তারা খোঁজ রাখেন না তন্ত্র হাজার দুয়ারের প্রসাদ। ভৈরব ভৈরবী সাধনা তার নির্ধারিত একটি প্রকোষ্ঠ মাত্র। তন্ত্রাচার বহুবিধ, নানা শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত। এক পথে এক একজন সাধনা করে থাকেন। যারা ভৈরব ভৈরবী রূপে সাধনা করেন তাদের বলা হয় বীরাচারী। এসব আচরণ সবার পালনীয় নয়। অথচ বাঙালীর প্রচলিত ধারণায় তন্ত্র সাধনা মানেই এক রকম যৌন ব্যভিচারের সুযোগ! তাদের মনে আসে না যে রামকৃষ্ণদেব একান্তই তন্ত্রাচারী।

শুধু রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, অরবিন্দ প্রভৃতির মত সাধকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বাঙালীর সঙ্গে তন্ত্রের কি সম্পর্ক তা স্পষ্ট করে তোলা যায় না। বাঙালী মাত্রেই যে তন্ত্রাচারী তার দু একটা নমুনা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'জুতো থেকে চণ্ডী পাঠ' প্রবাদ বাক্যের মধ্যেই ধরা আছে বাঙালীর প্রবহমান ধর্ম-চেতনার পরিচয়। বেদ হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা মান্য গ্রন্থ অথচ বাঙালীর কাছে কাম্য চণ্ডী। তার দেবকুলের মধ্যে বেদের কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই। অবশ্য অনেক পণ্ডিত শিবকে বেদের খাপে পুরে ফেলতে চেয়েছেন যা বে-খাপের নমুনা হয়ে আছে। শিব অনার্য রূপ-কল্পনার মধ্যে মানিয়ে যান। তাঁর পূজায় ব্রাহ্মণদের কোন ভূমিকা নেই। শিব অনার্য দেবতা। বাঙালীর দেব দেবী মাত্রেই অনার্য। তার আরাধ্য

দেবতা শিব, কালী, দুর্গা, চণ্ডী, সরস্বতী তান্ত্রিক দেব দেবী। কোন কোন দেব দেবী পুরাণের নায়ক নায়িকা। পুরাণকল্পনা পরিকল্পনার পিছনে আছে বৌদ্ধ ধর্মকে পরাভূত করার প্রচেষ্টা। পুরাণের রূপকল্পনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা কিন্তু করেছে তন্ত্র। বাঙালীর মাতৃমন্ত্রে দীক্ষাতান্ত্রিক সংস্কারের ফলশ্রুতি মাত্র। সর্বপ্রকৃতির মধ্যেই মায়ের অস্তিত্ব অনুভব তন্ত্র সাধনার পরিণাম তার অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি আচার আচরণের ধাপে ধাপে তন্ত্রের নানাবিধ আচার আচরণের পরিচয় ধরা পড়ে আছে।

বাঙলার শৈবশক্তি তন্ত্র সব থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। তারফলে অনেক বাঙালীর ধারণা একমাত্র শক্তির উপাসনাই তন্ত্র। বস্তুত এ ধারনা ঠিক নয়। বাঙলা দেশেই বৈষ্ণব তন্ত্রও প্রচলিত আছে। বাঙলার বাইরে তন্ত্রের সূর্য, গণেশ, গায়ত্রী, কুব্জিকা, সারিকা, বটুকভৈরব, গণেশ. পরমহংস প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবতার অর্চনা প্রচলিত আছে। তবে বাঙালীর মত মূর্তি পূজার ব্যাপকতা নেই। বাঙলার বাইরে সাধারণত তন্ত্রযন্ত্রেই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তবে তন্ত্রের সব থেকে প্রসার বাঙলায়। জন্মসূত্রে বাঙালী তন্ত্রবাদের সহজাত সংস্কারে আবদ্ধ। তন্ত্রের জন্মভূমিও বাঙলা দেশ। তন্ত্রের জন্ম ও লীলা ভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা ॥

তন্ত্র বিদ্যা গৌড়ে জন্ম হয়েছে, তার প্লাবন ঘটেছে মিথিলায়, মহারাষ্ট্রে প্রভাব কিছু থাকলেও এ বিদ্যা লয় পেয়েছে গুজরাটে। বচনটি প্রাচীন হলেও কোন সময়ে রচিত তা জানা যায় না। তবে এর ভেতরে ইতিহাসের এক অধ্যায়ের পরিচয় যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে তন্ত্রের পীঠভূমি ও সাধক বাঙলায় সব থেকে বেশি। আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ ধরে তন্ত্রাচারের একটা ধারার অস্তিত্ব কোন কোন পণ্ডিত লক্ষ্য করেছেন। শিবের প্রাধান্য দক্ষিণ ভারতে। তন্ত্রে শক্তিহীন শিব শব। তন্ত্র ও পীঠ স্থানগুলির অবস্থানের মধ্যে রহস্যময় ইতিহাসের এক অধ্যায় প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে।

অবশ্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন তন্ত্র ভারতে প্রবেশ করেছে উত্তর পশ্চিম দুয়ার থেকে। মত ও পথ বহন করে এনেছে 'মগী' পুরোহিতরা।

'মগী'রা আদিম পারশীক সমাজের পুরোহিত। মহেনজোদরোতে পাওয়া শিলমোহরে পারশীক পোষাকে পুরোহিতের ছবি আঁকা আছে। অনেকের মতে শিলমোহরটি তন্ত্র স্মারক।

অবশ্য তন্ত্র বহিরাগত তা প্রমান-সিদ্ধ আজও হয়ে ওঠে নি। তন্ত্রের জন্ম গৌড়ে তার প্রচুর প্রমান আছে যার উল্লেখের প্রয়োজন এখানে নেই। তন্ত্র বাঙলা দেশ থেকে প্রবেশ করে আসামে। তারপর বৌদ্ধদের সঙ্গে দেশের সীমা অতিক্রম করে নেপাল তিব্বত হয়ে প্রসার লাভ করে চীনে। জীবনে ভোগের স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করে গড়ে উঠেছে তন্ত্র। জীবনের ধর্ম স্বীকার করে ভোগকে মোক্ষ পথে চালিত করেছে বলেই তন্ত্র এমনভাবে প্রসার লাভ করেছে।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম জীবন ধারায় অগ্রসর ধ্যান ধারনার ভূমিতে তন্ত্রের জন্ম। তান্ত্রিক আচার আচরণের মধ্যে অনেক আদিম বিশ্বাসের পরিচয় যথাযথ রূপে বেঁচে আছে। নানারূপ কৃত্যা (যাদু) বশীকরণ, স্তম্ভন, উচাটন, মারণ, নরবলী প্রভৃতি ধ্যান ধারণা আদিম সংস্কারজাত যা অবলুপ্ত হয় নি। অবশ্য এসব আচার অনুষ্ঠান মাত্র তন্ত্র নয়। আদিম সমাজে ভারত ও তৎসন্নিহিত দেশগুলিতে একই রকম ধ্যান ধারণার বহু পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু সে সব আচার আচরণ সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ধারায় লুপ্ত হয়েছে, তত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় নি। তন্ত্র বাঙলা দেশেই তত্ত্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করে বৃহত্তর পরিচয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

বৈদিক ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের কোন মিল নেই, বরং বলা যায় বিপরীত মুখী পথেই তন্ত্রের গতি প্রকৃতি। তন্ত্রের উপজীব্য পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত পূজা যা শিব শক্তি নামে পরিচিত। চক্রে পুরুষ শিব নারী শক্তি—ভৈরব ভৈরবী। সবাই সামাজিক বন্ধনহীন। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোন ভেদাভেদ নেই। অবশ্য অনেক পণ্ডিত মনে করেন তন্ত্রের বীজ বেদের মধ্যেই আছে। ধর্মার্থ লাভের জন্য ইন্দ্রিয়ভোগের নানা নমুনা বেদের মধ্যে যে নেই তা নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রী-সঙ্গকে আধ্যাত্মিক রূপ দেবার চেষ্টার পরিচয় আছে। তন্ত্রের ষট্ চক্রের সঙ্গে কিছু কিছু মিল অথর্ববেদের সঙ্গে আছে।

এসব লক্ষণ দেখে তন্ত্র আর্যযুক্ত বলে ভাবা নিরর্থক। আর্যদের ভারতে প্রবেশ করার পূর্বেই তন্ত্র ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল তার পরিচয় প্রচুর পাওয়া গেছে। ধর্মের দৃঢ় ভিত্তি ছিল বলেই আগত বেদাচার সর্বভারতে

নিজ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। আদিম উৎপাদন রহস্ত অবলম্বন করে নানা রকম আচার আচরণের জন্ম দিয়েছিল। তন্ত্র তার সুসংস্কৃত রূপ গড়ে তোলার জন্য প্রচলিত ধ্যান ধারণার সত্যগুলি আত্মস্থ করে নিয়েছে। তাই তার রূপ হয়ে উঠেছে সমুদ্রের মত। নানা দিকের নদীর ধারা এসে তার মধ্যে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে।

অবশ্য বৌদ্ধ তন্ত্র বর্তমান হিন্দু তন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। বেদ বিরোধী তন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ে। বুদ্ধের তিরোধানের পরেই বিতর্কের পথ ধরে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়! মহাযানীরা আশ্রয় করে তন্ত্র। বজ্রযান হল বৌদ্ধতন্ত্রের শেষ পরিণাম। অনুমান করা যায় বৌদ্ধ তন্ত্রের আবির্ভাব সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার তাগিদ থেকে। তন্ত্র আশ্রয়ে বুদ্ধের শূন্যের নিরাকার আকারে রূপায়িত হয়ে ওঠে। নিরাকারকে সাকারে রূপায়নের পথ ধরে বাঙালীর প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করেছিল। বহুতর দেবদেবী পরিকল্পনার পথ ধরে বাঙলার ভাস্কর্য ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। বাঙালীর শিল্প আঙ্গিক নেপাল, তিব্বত এবং দ্বীপময় এশিয়ার ভূখণ্ডে প্রসার লাভ করে। এমন গৌরবময় ভূমিকা অর্জিত হয়েছিল বজ্রযানের প্রতিষ্ঠার ফলে। বৌদ্ধ-ধর্মের ব্যাপক প্রসারের পিছনেও ছিল এই বজ্রযান। বিখ্যাত বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও হিন্দু তান্ত্রিকের বেশির ভাগই বাঙালী।

বাঙালীর সর্বপ্রাচীন সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকলার যে রূপ তা বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবদেবীর রূপ। পাল যুগের চিত্রকলা নামে সে সব চিত্রকে অভিহিত করা হয়। লোক ধারায় যে সুশৃঙ্খল জীবন ধারা ও জীবন চর্চার নমুনা আমরা দেখি তার পিছনেও দাঁড়িয়ে আছে তন্ত্র। তাই বলা যায় বাঙালীর আত্মপ্রকাশ, ভাব-মণ্ডল, প্রতিভার বিকাশ, শিল্প সংস্কৃতির পাদপীঠ তন্ত্র।

বাঙালীর বাঙালিত্ব বলে একটা পরিচয় আছে যার ফলে ভারতের বুকে তার এক বিশিষ্ট ভূমিকা। বাঙলার শাস্ত্রসম্মত ইতিহাস বাঙালীয়ানার ইতিহাস অরচিতই থেকে গেছে। বাঙালীর জাতিগত একটি ভাবরূপ আছে যা তার জাতিগত অজ্ঞান সংস্কারের পথ ধরে নির্ধারিত রূপ লাভ করেছে। এই অজ্ঞান সংস্কার ভাবতত্ত্বরূপে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ক্রমে পরিণত রূপ পেয়েছে তন্ত্র আশ্রয়ে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা দিক থেকে বিবিধ অভিজ্ঞতা মন্থনের মাধ্যমে বিশিষ্ট একটি রূপ দিয়েছে যা ভারতীয় জীবন ধারা ভাব ধারার চূড়ান্ত পরিণাম—তাই বাঙালায়ানা।

বাঙালীর সাধনার পথ ধরে তন্ত্র বিশাল সমুদ্রের মত। নানা দিক থেকে নদীর ধারা এসে তার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। প্রচলিত সব মত নিজের মধ্যে ধারণ করে এমন সার্বজনীন রূপ নিয়েছে যা অন্য কোন ধর্ম পারে নি; সংসার ত্যাগ করে তবে পরমার্থ পাওয়ার সাধনা তা তন্ত্র বিশ্বাস করে না। তন্ত্র বাস্তববাদী। বস্তুতন্ত্রকে স্বীকার করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাধনবিধি তৈরী করেছে। গার্হস্থ্য জীবন যাপনের মাধ্যমেও যে মোক্ষ লাভ করা যায় তন্ত্রই তার প্রমান।

মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, পুরুষের সঙ্গে নারীর সশ্রদ্ধ জীবন যাপন করার মত অনেক বিধান আছে যা শুধু উল্লেখযোগ্য নয় মানুষ নামক প্রজাতির সম্পদ।

বাঙালীর সঙ্গে তন্ত্রের কি সম্পর্ক তা গ্রন্থযুক্ত রচনাগুলির মধ্য থেকেই পাঠক অনুমান করতে পারবেন। নতুন করে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। তবে যে ধ্যান ধারণা, আচার আচরণ বাঙালীর মজ্জায় তার সম্পর্কে বাঙালীর এমন অশ্রদ্ধা অজ্ঞতা বিস্ময়কর। তন্ত্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় ধারণা গড়ে ওঠার কারণ অনুসন্ধানে আগ্রহ জাগে। তন্ত্র আচরণ-মূলক এবং গুরুমুখী। আচার ভিত্তিক ধর্ম বলে সাধক ভেদে আচার ও পূজা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। পদ্ধতির নানা রূপ রূপান্তরও আছে। আচরণগত প্রভেদের কোন কোন অধ্যায় আছে যা একটি অন্যটির প্রতিকূল। কাপালিক, ক্ষপণক, বৈষ্ণব তন্ত্র, দিগম্বর, বীর, দিব্য এরকম একাধিক সম্প্রদায়গত ভেদও আছে। তন্ত্রশাস্ত্র গুরুগম্য বলে এত রকম রূপান্তরের দরজা খুলেছে। কারণ আধার ভেদে আচরণ বিধি নির্ধারিত হয়। তাই তন্ত্রাচারে দীক্ষা ও অভিষেক অপরিহার্য বিধান।

দীক্ষায় লাভ করে ইষ্টমন্ত্র। মন্ত্র তন্ত্রে দৈবশক্তিরই প্রতীক। মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র বিচার করে তবে গুরু দীক্ষা দান করেন। তন্ত্র দীক্ষায় জাতি বর্ণের কোন বাছবিচার নেই। বাঙালীর বেশির ভাগ পরিবারের কুলগুরু আছেন। বিংশ শতকের শেষ পাদেও প্রায় প্রতি পরিবারে এ আচরণ বিধি অবশ্য পালনীয় ছিল। অনেক ক্ষেত্রে গুরু বংশজাত বলে অনেক অনেক অযোগ্য গুরু সমাজে দীক্ষাদান মাধ্যমে অনেক ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। বিদ্যাহীন, নিয়ম নিষ্ঠাহীন গুরু তন্ত্র সাধনার অধোগতি ও অপযশের কারণ হয়ে আছে।

ইংরেজরা এদেশে আসার ফলে সমাজ জীবন দ্রুত পরিবর্তনের পথ

ধরেছিল। ব্রহ্মসমাজ আন্দোলন বাঙালীর স্বভাবজাত আচরণগত ধর্ম বিরোধী আন্দোলন। পাদ্রীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ থেকেই বেদও উপনিষদীয় ধ্যান ধারণার কাছে বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশ আত্মসমর্পণ করেন। ফলে তাঁরা তন্ত্র বিরোধী হয়ে ওঠেন। অবশ্য রামমোহন রায় নিজে যবনী-শক্তি সহযোগে তন্ত্র সাধনা করতেন। বেদ উপনিষদের সঙ্গে মিলিয়ে তন্ত্রগ্রন্থও রচনা করিয়েছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা বাঙালীর চেতনায় নতুন রকমের এক স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে বাঙালীর আচার আচরণগুলির মূল্য বোঝা সম্ভব হয় নি, অনেক আচার আচরণ কুসংস্কার বলে বর্জিত হয়েছিল। আচার আচরণগুলির কর্ম ও দার্শনিক তত্ত্ব যথাযথ রূপে ব্যাখ্যা হয় নি বলে নানা সংশয় সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ জ্ঞানে তন্ত্রের কিছু আচার আচরণ আছে যা সর্বসম্মত নীতিমার্গের পরিপন্থী।

ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা নতুন রকমের এক রুচি শুচি বোধ অর্জন করেছি যা বাঙালীর সহজ ধারার পরিপন্থী। বিদ্যাসাগর তার নাতনীকে 'মাগী' বলে সম্বোধন করতেন যা আমরা প্রকাশ্যে আজ উচ্চারণ করার কথা ভাবি না। দুর্ভাগ্যজনক ব্যক্তি স্বার্থ সচেতনতা, সতীত্ব বোধ, শালীনতা বোধ বিবিধ রকম পরিবর্তন বাঙালীর চেতনায় সেই সময় আশ্রয় করেছিল। বর্তমান বাঙালীর পরিশীলিত (?) রুচি ইংরেজদের কাছ থেকে অর্জিত।

কৃষি নির্ভর সমাজে জীবনের স্বাভাবিক সত্যগুলি সহজ ভাবেই থাকে। ইন্দ্রিয় বৃত্তি অনুরাগ, লোভ, হিংসা সহজ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আচার আচরণের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আচরণগুলিকে শুধু পরিশীলিত করে তোলা হয়। তন্ত্র মানুষের কাম ও হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে নিন্দা করেনি, স্বীকার করে নিয়ে তাকে আত্মোপলব্ধির পথে চালিত করেছে। মাটি থেকে বিচ্যুত জীবন স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে অশ্রদ্ধেয় করে তোলে। পরিণাম সহজ স্বাভাবিকতা হারিয়ে আচরণগুলি নেপথ্যচারী হয়ে ওঠে। গোপনে ও প্রকাশ্যে নানারূপ ব্যভিচার আত্মপ্রকাশ করে। যারা পরিশীলিত রুচি নিয়ে তন্ত্রাচারের আচরণগুলিকে নিন্দা করেন তাদের পণ্য প্রচারের মাধ্যম নারী দেহ। তন্ত্রে নারী মহাশক্তির আধার, ভোগের উপাদান নয়। বাঙালী ইংরেজী শিক্ষার ফলশ্রুতিতে যে নতুন মূল্যবোধ অর্জন করেছে তাতে নারীর মহিমা নারীত্বে নয় ভোগ্য উপাদানের।

ইংরেজ শক্তি বাঙলার গ্রাম জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। শোষণে জীর্ণ বিকলাঙ্গ মানুষের আচার আচরণ বিকৃতমুখী হয়ে ওঠার কথা। তন্ত্রের যে পরিচয় বেঁচে আছে তা একান্তই তার বিকৃত এবং ক্ষয়িষ্ণু রূপ। যে আচার আচরণ সূত্র চরিত্রে বেঁচে আছে তার অর্থ আর আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় বলে নিরর্থক মনে হয়।

বাঙালীর স্বভাবচ্যুতি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মানবিকতা ছিল খাঁটি বাঙালীর। ইংরেজী শিক্ষার আতস কাঁচ চোখে লাগিয়ে বাঙালীর ধর্ম কর্ম সমাজ সংস্কৃতি বুঝবার চেষ্টা করেননি। ইংরেজীয়ানার উন্মাদনার পথ ধরে ঐতিহ্যচ্যুতি বাঙালীকে বিপর্যয়ের পথে টেনে নিয়ে চলছে তা ছিল তাঁর কাছে বেদনার। "দেশের শিক্ষিত সমাজের অনেকে পরের মুখে ঝাল খাইতেছে। আমাদের তন্ত্রোক্ত ধর্ম ও বৈষ্ণবের মধুর রসের সাধনাকে লাম্পট্যের আকর বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। কাজেই মাঝে মাঝে প্রাণের জ্বালায় এক একটা কথা বলিতে হয়—"

পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণায় লালিত বাঙালী তখন নানা ভাবে বাঙালীর আচার আচরণের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করতেন। ইতিহাসের কোন কোন পর্যায় এরকম জাতির স্বভাবচ্যুতি ঘটে। তখন স্বদেশ প্রেমিক মাত্রেই বুকে অসহায় জ্বালা অনুভব করে থাকেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্র নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করার কথা ভাবেন নি। 'মনের জ্বালায়' তন্ত্র কি তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যা এখানে সংকলিত করা হয়েছে। নানা আলোচনায় তিনি তন্ত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগুলি লিখিত বলে একই কথা একাধিকবার বলেছেন। একই সময় একাধিক কাগজে প্রবন্ধ লেখার ফলে এরকম ঘটেছে। এগুলো লেখকের দোষ নয়—তাঁর লেখাগুলি একসঙ্গে করে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হবে তা বোধহয় ভাবেন নি।

তাই এরকম লেখকের লেখা সংকলন তৈরীতে সম্পাদকের সহিষ্ণু হয়ে পুনরুক্তিকে স্বীকার করেই রচনা বাছাই করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত বিষয়গুলিও বাদ দেওয়ার কথা ভাবা যায় না। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্র প্রসঙ্গ যে সব প্রবন্ধে ঘটেছে তা একই কথার পুনরাবৃত্তি বলে কোন কোন রচনা বর্জন করা হয়েছে।

বর্তমান গতিময় সমাজ থেকে তন্ত্র একেবারে লুপ্ত হয়েছে তা বলা যায় না। বাঙালীর জীবন চর্চায় সে এমনভাবে আত্মগোপন করে আছে যে আমরা তাকে চিনতেই পারি না। জলের মধ্যে মাছ যেমন জলের কথাই ভুলে থাকে, তেমনি বাঙালী ভুলে থাকে তন্ত্র সম্পর্কে। সচেতন ভাবে যে তন্ত্র চর্চা তার অনেকটাই অজ্ঞতা প্রসূতার পথ ধরে যাতায়াত করে। শিল্প চর্চায় যে তন্ত্র শিল্পের প্রসার তার জন্ম অভিনবত্ব লাভের পথ ধরে। তন্ত্র অনেকে ব্যবহার করেন অভিচারমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু প্রাপ্তির আশায়। তার ফলে একদল চতুর ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা তন্ত্র মাধ্যমে রহস্যময় জীবনযাত্রা নির্বাহ করে নিজের সুবিধা করে নেয়।

তন্ত্রের বর্তমান পরিণতির সম্ভাবনা তার মধ্যেই ছিল। আদিম সৃজনশীল যাদুবিদ্যার বহু আচার আচরণ তন্ত্র আশ্রয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের প্রাথমিক স্তরে সব কালেই আদিম বিশ্বাসকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়েছে। মন্ত্রের শক্তির প্রতি অতিরিক্ত আস্থা এর পিছনে কাজ করেছে। তন্ত্রে মন্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মন্ত্রের আবির্ভাব মানুষের সমাজে কোন সময় থেকে তা বলা যায় না। দৈনন্দিন জীবন সুরক্ষিত করার তাগিদ থেকে অলৌকিক শক্তি বিকাশের মাধ্যমরূপে মন্ত্রের আবির্ভাব। পরবর্তী স্তরে চিন্তার অগ্রগতির পথে আদি বিশ্বাস মন্ত্র, মুদ্রা ও যন্ত্ররূপে আশ্রয় পেয়েছে। বেদেও ইহলোক পরলোক উভয় লোকের অভীষ্ট সাধনে মন্ত্র মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মীমাংসকেরা মন্ত্র অস্বীকার করতে পারেন নি, মন্ত্রের শক্তির একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তন্ত্রের সব শাখাতেই মন্ত্রের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে

ফলশ্রুতিতে বহুরকম ভ্রান্তি আজ তন্ত্রের নামে চালাবার সুযোগ হয়েছে এবং এক শ্রেণীর মানুষ তা অনুসরণ করে। তার ফলে তন্ত্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় ধারণা লুপ্ত না হয়ে ক্রমেই বিকৃত প্রতিমা হয়ে বাঙালীর বুকের উপর চেপে বসার সুযোগ পাচ্ছে।

তন্ত্রের বহু গ্রন্থ অবলুপ্ত হয়েছে ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পথে। তন্ত্রের লিখিত রূপ আত্মপ্রকাশ করে বৈদিক যুগের পর থেকে। তারপরে অসংখ্য তন্ত্র গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং পরবর্তী যুগে মূল গ্রন্থের পরিবর্তনও ঘটানো হয়েছে। ভারতের প্রায় সব অংশ থেকেই স্থানীয় বা স্থানান্তরের অক্ষরে লিখিত তন্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। সব তন্ত্র গ্রন্থ সাধারণতঃ সর্বভারতীয়

প্রসার লাভ করেনি। বাঙলার তন্ত্রগ্রন্থও তাই বাঙলার বাইরে খুব একটা পরিচিত নয়। অবশ্য কিছু বাঙলার তন্ত্রগ্রন্থ বাঙলার বাইরে স্থানীয় অক্ষরে লিখিত হয়েছিল যা আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাঙলা দেশে যে তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। গ্রন্থগুলি লিখিত রূপ এমন দুর্বোধ্য যে অনধিকারীর পক্ষে তার রহস্য অনুভব করা আয়াসসাধ্য কাজ। আগমবাগীশ লিখিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটি মূল্যবান সংকলনরূপে পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তন্ত্র তার মাধ্যমেও আজকের মানুষের কাছে সহজগম্য বা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে না। সহজ সরল বাঙলা ভাষার মাধ্যমেই লিখিত গ্রন্থ মূল্যের রহস্য কিছু অধিগম্য করে তুলতে পারে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাই করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ভাষা সহজ সরল, বোঝাবার ভঙ্গী হৃদয়গ্রাহ্য। তার ফলে লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্য থেকে তন্ত্র এবং তন্ত্রের সত্যরূপ, বাঙালীর জীবন চর্চায় তন্ত্রের ভূমিকা সহজ হয়ে ওঠে।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

জীবনী

জন্ম : ১৮৬৩ খৃঃ, মৃত্যু : ১৯২৩ খৃঃ। বি, এ, পাশ করার পর কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে সরকারী চাকুরী ও অধ্যাপনা করলেও, পরবর্তী জীবনে সাহিত্য চর্চাই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। বসুমতী, বঙ্গবাণী, হিতবাদী, রঙ্গালয়, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় একের পর এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নায়ক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। রূপলহরী, উমা উপন্যাস রচনার সঙ্গে অনুবাদ করেছিলেন আইন-ই-আকবরী।

দুরূহ বিষয়বস্তুকে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করার অসাধারণ দক্ষতা তাঁর ছিল। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস ও তন্ত্র গবেষণা প্রবন্ধগুলি গবেষক মহলে সমাদৃত। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, ধর্ম, আলোচনায় প্রবন্ধগুলি অপরিহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রবন্ধের কোন কোন অংশ প্রবাদ বাক্যের মত গবেষকরা ব্যবহার করে থাকেন। তন্ত্রের রহস্য এবং তত্ত্ব এমন সহজ ভাষায় আর কোন লেখক লিখতে পারেন নি।

রচনাগুলি 'প্রবাহিনী' ও 'নারায়ণ' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব

১

দেহতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায় না। কারণ তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবদেহ—বিশেষতঃ মানবদেহ যে পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্ট হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই একই পদ্ধতি অনুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে পদ্ধতির কোনরূপ বৈষম্য নাই। যে ক্রিয়া জীবসৃষ্টির ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া বিশ্বসৃষ্টিতে বিরাট ও বিশাল ভাবে ঘটে। উন্মেষের ক্রম ও পদ্ধতি উভয় পক্ষেই এক ; এমন কি, এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু সৃষ্টি হইতেছে, সকলেরই সৃষ্টির ক্রম ও পদ্ধতি একই রকমের। কেবল সৃষ্টির কেন, নাশেরও—সংহারকার্য্যের ক্রম ও পদ্ধতি একই রকমের। তন্ত্রসিদ্ধান্তের এই সর্ববাপিত্বটুকু, এই সর্বজনীন ও সার্বভৌম ভাবটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তন্ত্রের মহিমা উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে! তাই গোড়ায় তন্ত্রের দেহতত্ত্বের গোটাকয়েক সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছি। এইবার সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিব।

তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে মনীষী মান্যবর বিচারপতি মিঃ জে, জি, উড্‌রফ মহাশয় গত ৮ই জানুয়ারি তারিখে ডালহৌসি ইনষ্টিটিউট্‌গৃহে একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন। স্যর জন উড্‌রফ ইংরেজী ভাষাতে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের দার্শনিক অংশটুকু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত সৃষ্টিতত্ত্বের সিদ্ধান্তের তুলনায় সমালোচনা করেন নাই। তথাপি বলিব, দার্শনিক অংশটুকু তিনি যে ভাবে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবে তন্ত্রসিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই। শুনিলাম, তাঁহার এই সন্দর্ভ বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করা হইতেছে। আমরা তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া তাঁহার বক্তব্যের মর্মানুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপঢৌকন দিব ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যও বলিয়া রাখিব। তবে আগাগোড়া সকল কথা একটা সন্দর্ভে বলা চলিবে না, ধীরে-ধীরে সকল সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিব।

এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনবরত ও অবিশ্রান্ত জন্ম মৃত্যু ঘটিতেছে, একটা

পরিবর্তনের প্রবাহ চলিতেছে। এই পরিবর্তনের প্রবাহের মধ্যে একটা অপরিবর্তনীয় বিষয়ের অনুভূতি হয়ই। নদীর জল স্রোতোমুখে অনবরত চলিয়া যাইতেছে; যে জল এই সম্মুখে আবর্তবেগে উথলিয়া উঠিয়াছিল, সে জল আর নাই, ভাসিয়া গিয়াছে; তথাপি মনে দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে, এক নদীর জলই দেখিতেছি এবং স্পর্শ করিতেছি। গঙ্গা চিরকালই আছেন, চিরকালই গঙ্গাগর্ভ বহিয়া জল চলিয়া যাইতেছে; যে জল কাল গিয়াছে, সে জল আজ যাইতেছে না, তথাপি যুগে যুগে সবাই বলিয়া আসিতেছে যে—গঙ্গার জল পবিত্র, গঙ্গা পতিতপাবনী, সবপাপসংহন্ত্রী। আমি আছি,—শৈশবে যেমন আমি ছিলাম, যৌবনে সেই আমি বিরাজ করিয়াছি, প্রৌঢ় কালে সেই আমার আমিত্বের অনুভব হইয়াছে, এখন বার্দ্ধক্যে সেই আমি—সেই সোপাধিক আমির সম্যক্ অনুভূতি হইতেছে। অথচ ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে, বর্ষে বর্ষে আমার দেহের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ঘটিতেছে; আকারে, প্রকারে, বর্ণে, রূপে, বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে আমার পরিবর্তন ঘটিয়াছে;—তথাপি কিন্তু আমার আমিত্বের বোধটুকু আজন্ম মরণ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে রহিয়াছে এবং থাকিবেও। এই যে নিত্য-পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনের ভাব, এই যে এক পক্ষে অনবরত পরিবর্তন, অন্য দিকে নিত্য সত্যবস্তুর দ্যোতনা, ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা। কূটস্থ চৈতন্যের চারি দিকে মহামায়া প্রকৃতি সতীর লীলা হইতেছে। সেই কূটস্থ চৈতন্য পরমপুরুষ সচিদানন্দস্বরূপ; তিনি অখণ্ড স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান; তাঁহাতে পরিবর্তন নাই, ক্রিয়া নাই, বিকার নাই, বিভব নাই। তিনি অনাদি কাল হইতে আছেন এবং অনাদি কাল পর্যন্ত থাকিবেন; তাঁহাতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ নাই। তিনি কেবল বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রকৃতিদেবী লীলা করিতেছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি সেই মহামায়ার খেলা, তাঁহারই বিভূতি। এই সৃষ্টিলীলার মধ্যে সর্বব্যাপীরূপে নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন পুরুষ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই, পরিবর্তনের আবর্তে একটা স্থিতির ভাব সদাই ফুটিয়া আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়াই সৃষ্টি; পুরুষ হইতে অব্যাহত স্থিতির বোধ ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতি কেবল নাম রূপের দ্যোতনার সাহায্যে পরিবর্তনের আবর্ত ঘটাইতেছেন। প্রকৃতির আবার দুইটা বিভাগ আছে; এক—মূলা প্রকৃতি দ্বিতীয়—সৃষ্টি প্রকৃতি। মূলা প্রকৃতিই বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রে মূলভূতা অব্যক্তা। এই মূলা প্রকৃতিই সৃষ্টিকামনার, একে বহুত্বের দ্যোতক। এই মূলা

প্রকৃতিই আদ্যাশক্তি সনাতনী। এই মূলা প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টিপ্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই চণ্ডী বলিতেছেন,—

'বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥'

এই বিসৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ এই বিশ্ববিকাশের মধ্যে তুমিই সৃষ্টিস্বরূপা এবং ইহার পালন ব্যাপারে তুমিই স্থিতিরূপা, পরে এই বিশ্ববিকাশের সঙ্কোচ ও সংহরণকার্যে তুমিই সংহাররূপিণী; অতএব এই জগতের তুমিই জগন্ময়ী দেবী। বিসৃষ্টি কাহাকে বলে, তাহা পূবে বুঝাইয়াছি। মনীষী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দেবীসূক্তের ব্যাখ্যার কতকাংশ উদ্ধার করিয়া বিসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছি। সুতরাং তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। সচ্চিদানন্দ পুরুষে এক আমি বহু হইবার কামনা যখন ফুটিয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে —মূলা প্রকৃতির কার্য সূচিত হইয়াছে। এই মূলা প্রকৃতি পুরুষে নিত্য বিদ্যমান। যখন তিনি সম্মূঢ় অবস্থায় থাকেন, তখন প্রলয়কাল; যখন তিনি জাগিয়া উঠেন, তখন সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির নাম ও রূপ এই মূলা প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত; কিন্তু সৃষ্টি প্রকৃতিতেই উহার সম্যক্ বিকাশ হইয়া থাকে।

দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া তন্ত্র বলিতেছেন যে, প্রকৃতি পুরুষ সকল জীবদেহেই বিরাজ করিতেছে। পুরুষের দেহে পুংস্ত্বের প্রাবল্য, স্ত্রীত্ব সম্মূঢ়; নারীর দেহে স্ত্রীত্বের প্রভাব অধিক, পুংস্ত্ব সম্মূঢ়। পুরুষের মনে এক আমি বহু হইব, এই কামনার উদ্রেক না হইলে, স্ত্রীর মনে সেই বহুত্বের কামনার প্রতি অনুরাগের ভাব না জাগিলে, উভয়ের সম্মেলনে নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। যে পদ্ধতিক্রমে নর-নারীর সংযোগে নূতন জীবনের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষের প্রভাবে নূতন জীবে আমিত্বের বোধ ফুটিয়া উঠে, দেহের মধ্যে যাহা কতকটা স্থিতিবাচক, তাহারই সৃষ্টি হয়, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ, যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহারই সৃষ্টি হয়। তাই তন্ত্র অনুমান করেন যে, মেদ, মজ্জা, অস্থি, নখ প্রভৃতি পিতৃবীর্য্যে সৃষ্ট হয়; মাতৃরজে শোণিত, মাংস, চর্ম, কেশ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তেমনি বিশ্বসংসারে পুরুষ-প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ ও মূলা প্রকৃতির মধ্যে একটা স্পন্দনের —কম্পনের ভাব অনুভূত হয়। এই স্পন্দনের জন্যই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিয়োগ ও মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন; আর সেই

বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টিপ্রকৃতির লীলা হইতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ। এই বিন্দুতে বিলাস করিয়া মহামায়া সৃষ্টি ঘটাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম বিন্দুবিলাসিনী। এই স্পন্দন-তত্ত্বের সাহায্যে বৈষ্ণবদিগের রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা যায়, এবং উহা হইতেই শাক্তদিগের উমার নাচের (অর্থবাদের) গূঢ় অর্থ বুঝা যায়। মহাকাশে যাহা স্পন্দন, নর-নারীর মধ্যে তাহা কাম ও মদনের লীলা। দেহের মধ্যে 'আমি আছি' এই অবিকারী জ্ঞানময় মহাদেব বা শিবলিঙ্গ যেন চক্রে চক্রে বিবাজ করিতেছেন; সেই শিব আছেন বলিয়া দেহ-প্রকৃতির নানা লীলা ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে —নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে একটা অপরিবর্তনের ভাব নির্বাতনিষ্কম্প প্রদীপদ্যুতির মতন বিরাজ করিতেছে। তেমনই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন শিব চক্রে চক্রে বিরাজ করিতেছেন; তিনি আছেন বলিয়া পরিবর্তনের ভীম ভৈরব আবর্তনের মধ্যে একটা সনাতন ভাবের জ্ঞান বা বোধ যেন সর্বব্যাপী হইয়া আছে। কাম ও মদনজন্য যেমন নূতন জীবের নাম ও রূপের বিকাশ হয়, তেমনই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে কাম ও মদনের স্পন্দন জন্য বিশ্বব্যাপী নাম এবং রূপের বিকাশ হইয়াছে। ইহাই হইল বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে পদ্ধতির সমতাবিষয়ক গোটাকয়েক মোটা কথা। তন্ত্রবিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিবশক্তির এবং জীবসৃষ্টির জন্য নর-নারীর মিলনের একতা পদে পদে খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আছে। বাহ্য প্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে শিবশক্তির সামঞ্জস্য কেমন করিয়া ঘটে, তাহা তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রে পাওয়া যাইবে না। উপনিষদ্ ও পুরাণে ইঙ্গিতে কথাটি বলা আছে। বলিয়া রাখা ভাল যে, তন্ত্র এই সৃষ্টিতত্ত্ব যতটা ফুটাইয়া— খোলসা করিয়া বলিযাছেন, এতটা আর কোন শাস্ত্রে খুলিয়া না বলিলেও সৃষ্টিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রই একমত। শ্রুতির 'এক আমি বহু হইব' এই মহাকাব্যের উপর নির্ভর করিয়া সকল শাস্ত্রই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল অদ্বৈতবাদে পরের পর্যায়গুলিকে মায়াজন্য বলিয়া 'মিথ্যাভূত' এই ভাবে আখ্যাত করা হইয়াছে। তন্ত্র সাধনার ধর্ম, সাধনার সম্বল এই নরদেহ লইয়াই যত ব্যস্ত, তাই সাধনার সহায়তার উদ্দেশ্যে তন্ত্র, সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্ব মিলাইয়া বিশ্বসৃষ্টির প্রহেলিকা বুঝাইয়াছেন।

মূলা প্রকৃতি হইলেন আদ্যা শক্তি; তাহা হইতেই জড় প্রকৃতির উদ্ভব। এই মূলা প্রকৃতির বিকৃতিই নাম ও রূপ, নাম ও রূপ হইতে বিশ্বসৃষ্টি।

নাম রূপ বেদান্তের মতে অবিদ্যাজাত, স্নুতরাং মিথ্যা। তন্ত্র বলেন,—মূলা প্রকৃতি আদ্যা শক্তি যখন সনাতনী, তখন তদ্ভব নাম ও রূপ মায়াজন্য হইলেও মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। মনুষ্যদেহ যেমন জড় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত—মায়াজন্য, অতএব মিথ্যাভূত হইলেও উহারই সাহায্যে সাধনা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া থাকি, তেমনি বিশ্বসৃষ্টির নাম-রূপকে অবজ্ঞা করিলে নামরূপের অতীত যিনি, তাঁহাকে বুঝিতে ধরিতে পারা যাইবে না। কেবল বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কথা আছে—'বিচারে পণ্ডিত, আচারে সাধু'—বিচার করিয়া, কেবল তর্ক করিয়া সংসারকে মায়াময় সিদ্ধান্ত করিলে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ হইতে পারে বটে, পরন্তু আচারবান্ কর্মী না হইতে পারিলে সাধু হওয়া যায় না, সাধু না হইলে মিথ্যার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান ঠিকমত করা যায় না। তন্ত্র বার বার বলিতেছেন,—'যৎ যৎ শাস্ত্রমধীতং তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ'—যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, সেই সেই শাস্ত্রের অনুকূল ব্রতের আচরণ না করিলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ঠিকমত বুঝিতেই পারিবে না। অতএব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ঠিকমত বুঝিতে হইলে ব্রতাচরণ করিতেই হইবে। কর্মীর পক্ষে 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য' বলিলে কোন ফলোদয় হইবে না; পরিণামে হয়ত কর্মী নাস্তিক হইতে পারে। এই হেতুই অনেকে বলিয়াছেন যে, 'মায়াবাদম্ অসৎশাস্ত্রম্ প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব তৎ,' অর্থাৎ মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র, উহা বৌদ্ধের নাস্তিক্য ধর্মের প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। তন্ত্র বলেন, এই সংসারে যদি কিছু জ্ঞেয় থাকে, তবে সে তোমার দেহ। ঐ দেহের সাহায্যে তোমার জ্ঞানোদয় হয়, ঐ দেহের সাহায্যে তুমি জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য বলিয়া থাক, ঐ দেহের সাহায্যে তোমার আত্ম-অনুভূতি হইয়া থাকে এবং সেই অনুভূতি হইতে তুমি বিশ্বাত্মার ধারণা করিতে সমর্থ হও; অতএব এই দেহটাকে বাতিল করিলে চলিবে না। দেহকে মান্য করিলেই দ্বৈতবাদ আসিবেই, আমি ও তুমির বোধ হইবেই। বাস্তবিক যত দিন সাধক থাকিতে হইবে, তত দিন আমি ও তুমির ভেদ থাকিবেই। সাধনার প্রভাবে আমি ও তুমি যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহা বুঝিতে পারিব। যত দিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ না হইতেছে, যত দিন রামপ্রসাদের মতন 'এবার কালি তোমায় খাব, তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাবো' এই ভাবটা মনে না জাগিবে, তত দিন মা ও ছেলে, প্রভু ও ভৃত্য, পিতা ও পুত্র, সখা ও মিত্র, স্বামী ও স্ত্রী, গুরু ও শিষ্য পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবেই। এই পার্থক্যের ভাব ভ্রান্তিমূলক হইতে

পারে, পরন্তু যত দিন আমরা দেহী, তত দিন এই ভ্রান্তির সাহায্যে জগদ্‌ভ্রান্তির অপনোদন সাধন করিতেই হইবে। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই তত্ত্বের অনুসারে ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রান্তির নিরসন কর্তব্য। ইহাই তন্ত্রের সার কথা—গোড়ার কথা। সেই গোড়ার কথা কহিয়া তন্ত্র বলিয়াছেন যে, আমার পদ্ধতি অনুসারে কর্ম করিয়া দেখ—সাধনা করিয়া দেখ; অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে, আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কি না!

ভাবের দিক্ দিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এইখানে তন্ত্রের সহায়তা করিয়াছেন। তন্ত্রের শাক্ত সাধকগণ বলেন যে. শিব ত স্থাণুসদৃশ একটা বিদ্যমানতার দ্যোতক মাত্র, তাঁহার উপাসনা করি কোন্ হিসাবে? শক্তি না থাকিলে শিব ত শব, অথচ শক্তিশূন্য শিব হইতেই পারেন না। অতএব শিব আছেন, মাথার উপর থাকুন, আমরা মায়ের—আদ্যা শক্তির উপাসনা করিব। কারণ, তিনিই ত সব—তিনি মেধা, তিনি মায়া, তিনি লজ্জা, তিনি ক্ষমা, তিনি বুদ্ধি, তিনি ধৃতি, তিনি বিদ্যা, তিনি ছায়া. তিনি শান্তি, তিনি ক্ষান্তি—তাঁহাকে পূজা করিব না ত কাহার পূজা করিব? সত্য বটে যে—

'যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্কচিৎ বস্তু সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥'

হে অখিলাত্মিকে মহামায়া, এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু সৎ বা অসৎ থাকুক না, সে সবই তুমি; কারণ, সে সকলের অন্তরালে তোমারই শক্তি খেলা করিতেছে, অতএব তোমার আবার স্তব স্তুতি কি ও কেমন। তথাপি তিনি আমাদের জ্ঞানের, আমাদের বোধের ত অতীত নহেন; তাই তাঁহার সাধনা করিলে শিবমুক্তি বুঝা যাইবে, বিদেহমুক্তিও লাভ হইতে পারিবে। কারণ, সৃষ্টিলীলা বুঝিতে হইলে তাঁহাকেই সর্বাগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। সপ্তশতী চণ্ডীতে সিদ্ধান্তের কথাসকল ভাবের ভাষায় সুন্দর ব্যাখ্যা করা আছে। চণ্ডী বুঝিতে পারিলে এই দেহতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব পরিষ্কার বুঝা যায়। ভাবের সহিত অলঙ্কারের ভাষ্য মিলাইয়া তন্ত্রের বহু সিদ্ধান্ত চণ্ডিতে যেমন ব্যাখ্যাত আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। এক হিসাবে সপ্তশতী চণ্ডী তন্ত্রের সার। গীতা যেমন উপনিষদ্‌সকলের সার, চণ্ডীও তেমনি তন্ত্রের ভাবের ও সিদ্ধান্তের সার। তাই এক দিন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ হইত; বেদের পরেই চণ্ডীকে বাঙ্গালী পূজা ও উপাসনা করিত। চণ্ডী গালগল্প নহে, আষাঢ়ে গল্পের পুঁথি নহে, দেহতত্ত্বের এবং সৃষ্টিতত্ত্বের সিদ্ধান্তপূর্ণ

অপূর্ব ও উপাদেয় গ্রন্থ। তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গেলে চণ্ডীর কথা স্বতঃই মনে পড়ে বলিয়া এইটুকু এইখানে বলিয়া রাখিলাম।

২

একটা মজার কথা এইখানে বলিব। যাঁহারা পুরাণের আঠারোখানা বই পড়িয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ স্বতন্ত্র ; এক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণের বিবরণ অন্য পুরাণের বর্ণনা হইতে অনেকটা পৃথক্। এ পার্থক্য কেন ঘটে? সৃষ্টি যখন হইয়াছিল বা পরে যখন আবার হইবে, তখন একই পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল, একই ক্রম অনুসারে হইবে। অধুনা কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, অষ্টাদশ পুরাণ এক মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাসের রচিত ; তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, তাঁহার মস্তিষ্কে মিথ্যার বিকাশ হইবার নহে, সদাই সত্য প্রতিভাত হইত। তবে তাঁহার প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ ভিন্ন রকমের কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমি দুই রকমে দিব। পুরাণকর্তার উল্লেখ করিতে যাইয়া পুরাণই বলিয়াছেন —ব্যাসাদিমুনিভিঃ রচিতম্— যাহা ব্যাস প্রমুখ মুনিদিগের রচিত, তাহাই পুরাণ। সুতরাং বুঝিতে হইবে, পুরাণসকল এক জনের রচিত নহে, বহুবচনান্ত 'ব্যাসাদিমুনিভিঃ' বলাতেই স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পুরাণসকলের কর্তা এক জন নহেন ; বহু মুনির দ্বারা উহা রচিত হইয়াছে ; তবে পুরাণকর্তাদের মধ্যে ব্যাস প্রধান। কিন্তু ব্যাস এক জন নহেন ; পুরাণ হইতেই জানিতে পারা যায় যে, আটাশ জন ঋষি ও মুনি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন ; বাদরায়ণ বেদব্যাস তাঁহাদের মধ্যে একজন। ব্যাস শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাতা—বিভাগকর্তা ; যিনি শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া শাস্ত্রমর্ম প্রকাশ করেন, তিনিই ব্যাস। সুতরাং 'ব্যাসাদিমুনিভিঃ' বলাতে তিনি যে, পুরাণকর্তা বাদরায়ণ ব্যাস, তাহা বুঝাইতেছে না। বাদরায়ণ ব্যাস কোন একখানা পুরাণ রচনা করিলেও করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। কেবল ব্যাস শব্দ ব্যবহার করাতে বুঝিতে হইবে যে, আটাশ জন ব্যাস উপাধিযুক্ত মুনিদিগের মধ্যে অনেকে, অথবা সকলেই এবং আরও অন্য মুনি মিলিয়া মিশিয়া এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা করিয়াছিলেন। আরও একটা কথা ভাবিতে হইবে, পুরাণ ঋষিপ্রণীত নহে ; বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে যে, পুরাণ মুনিবিরচিত। মুনি

এবং ঋষিতে অনেক পার্থক্য আছে। বাদরায়ণ বেদব্যাস ঋষি ছিলেন, মুনি ছিলেন না। অতএব বলা যাইতে পারে যে, বাদরায়ণ বেদব্যাস পুরাণের রচনা করেন নাই, যে সকল মুনি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এবং অন্য মুনি পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অষ্টাদশ হইতে এমন অনেক বচনপ্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, যাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরাণসকল যে এক জনের রচিত নহে, তাহা পুরাণকারেরা নিজ নিজ লিখিত পুরাণেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ কলিকাতায় এমন রাসভবুদ্ধির লেখক দুই একটি আছেন, যাঁহারা জীবনে কখনও কোন পুরান উল্টাইয়া দেখেন নাই, রামায়ণ মহাভারতও আগাগোড়া পড়েন নাই, কেবল পরের মুখে ঝাল খাওয়া গোঁড়ামির উপর নির্ভর করিয়া নিজেদের কোটে বসিয়া লেজ সাপ্‌টা মারিয়া বলিয়া থাকেন যে, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এক বেদব্যাসেরই রচিত। ইহারা শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি জানেন না, ইংরেজী হিসাবেও তর্ক বিচার করিতে পারেন না। উপেক্ষার অবহেলায় ইহাদের কথা উড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য। পরন্তু ইহাও সত্য বটে, এমনই একটা প্রবাদকথা হিন্দু সমাজের সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচারিত আছে বটে যে, একা বেদব্যাসই অষ্টাদশ মহাপুরাণের রচনা করিয়াছিলেন। পুরাণধর্ম প্রচারিত হইবার পর, পুরাণসকলকে লোকদৃষ্টিতে একটু বড় করিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যেই এইপ্রবাদটা জনকয়েক স্মার্ত্ত পণ্ডিতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ বাদরায়ণ বেদব্যাস পুরাণের রচনা করেন নাই, পুরাণসকল একজন ব্যাসের দ্বারা রচিত নহে, পুরাণসকল এককালে এক যুগে বা এক সময়ে রচিত হয় নাই। যখন ভিন্ন ভিন্ন লেখক, তখন সৃষ্টির theory বা অনুমান ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবারই কথা; প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ ভিন্ন রকমের দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ দেখি না। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের কাছে সৃষ্টিপ্রকরণটা যেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি তেমনই ভাবে তাহা লিখিয়াছেন। এই গেল এক রকমের উত্তর।

দ্বিতীয় রকমের উত্তর এই। প্রত্যেক পুরাণই এক একটা সিদ্ধান্তকথার বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব প্রভৃতি পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত মত প্রচারের জন্য এক একখানি পুরাণ আছে। আবার এই পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বাদ অনুসারে পুরাণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ফলে প্রত্যেক

পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ এই বাদ অনুসারে ভিন্ন রকমের হইয়া গিয়াছে। আর একটি কথা আছে। বৈষ্ণব পুরাণ মাত্রেই, যথা—বিষ্ণু, গরুড়, নৃসিংহ, ক্ষাত্রপুরাণ অর্থাৎ ক্ষত্রশক্তি বিকাশের, ক্ষাত্র মহিমা প্রচারের পুরাণ। আর শৈব ও শাক্ত পুরাণে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার কথাই ফুটাইয়া তোলা আছে। বৈষ্ণব পুরাণসকলে অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতিকে শাক্ত বা শৈব ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে; যেমন রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংসপ্রমুখ অসুর মাত্রেই শৈব বা শাক্ত,—এবং বৈষ্ণবদ্বেষী। পাল্টা জবাবের হিসাবে শৈব ও শাক্ত পুরাণে বিষ্ণুভক্ত অসুর বা দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় রাজার উল্লেখ আছে। জয়দেবের সময় হইতে বাঙ্গালার লোকসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া আছে যে, ভগবান্ দশটা অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার, তাহার মধ্যে প্রধান বাইশ জন। শ্রীমদ্ভগবতের তালিকায় সে বাইশটি অবতারের উল্লেখ নাই। আমার মনে হয়, শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে আপোস করিয়া, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইয়া ভগবানের দশটা অবতারের উদ্ভব সাধন হইয়াছে। দশ অবতারের মধ্যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ, পাঁচ জন ক্ষত্রিয়; মৎস্য, বরাহ, বামন, পরশুরাম এবং কল্কী, এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ, কূর্ম, নৃসিংহ, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ, এই পাঁচ জন ক্ষত্রিয়। শৈব ও বৈষ্ণব পুরাণে নৃসিংহের জাতি লইয়া একটু বিরোধ আছে। শৈব পুরাণমতে নৃসিংহ ব্রাহ্মণ এবং শিবের অবতার, বিষ্ণুপুরাণমতে নৃসিংহ ক্ষত্রিয় এবং বিষ্ণুর অবতার। এই আপোস এবং বিরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিবার চেষ্টা করিলে প্রত্যেক পুরাণ হইতেই এক একটা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে। সৃষ্টিপ্রকরণ প্রত্যেক পুরাণের সূচক বা Introductory; সৃষ্টিপ্রকরণ পাঠ করিলেই কতকটা বুঝা যায় —সেই পুরাণে কোন্ সিদ্ধান্তের কেমন্ বিশ্লেষণ করা হইবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সৃষ্টিতত্ত্ব দেহতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া লেখা। বিশ্বসৃষ্টি এবং মনুষ্য বা জীবদেহসৃষ্টি যে একই প্রকরণ অনুসারে হইয়া থাকে, ইহা তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত সকল পুরাণই গ্রহণ করিয়াছেন। দেহতত্ত্বের বিশেষণ যে পুরাণে যে ভাবে করা হইয়াছে, সেই পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। শিব, কালিকা, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ প্রভৃতি শৈব ও শাক্ত পুরাণসকলে তন্ত্রের সিদ্ধান্ত ষোল আনা অনুসরণ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ লেখা হইয়াছে। বৈষ্ণব পুরাণসকলে

পুরা দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শৈব ও শাক্ত কখনই জীব ও শিবের পার্থক্য ঘটান না, তেমন চিন্তাও করিতে পারেন না। বৈষ্ণব, জীব ও ঈশ্বরে নিত্য পার্থক্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং তদনুসারে সৃষ্টিপ্রকরণের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শন হইতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দর্শনের উন্মেষভঙ্গী যেন কতকটা বুঝা যায়; মনে হয়, অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদের একটা সংস্করণ অথবা বৌদ্ধ শূন্যবাদ ঔপনিষদ অদ্বৈতবাদের একটা নিরীশ্বর সংস্করণ। তন্ত্রের জীব শিবে একীকরণ বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও অদ্বৈতবাদের আপোস মাত্র। Personal God, একটা স্বতন্ত্র ঈশ্বরের কল্পনা তন্ত্রেও নাই, বৌদ্ধ দর্শনেও নাই। বৌদ্ধ শূন্যবাদকে আস্তিক করিতে হইলে প্রথম অদ্বৈতবাদে আসিয়াই পড়িতে হয়। তন্ত্র তাহার উপর একটু রসান চড়াইয়া আত্মাকেই, জীবদেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকেই উপাস্যে পরিণত করিয়াছেন। অতিপুরাতন তন্ত্রসকলে কেবল শক্তির সাধনাই আছে; যে শক্তির দ্বারা জীবদেহ সঞ্জীবিত, সেই শক্তির অন্বেষণ আছে,—উপাসনা নাই, ভাবের বিকাশ নাই; অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে আসক্তির সাহায্যে রূপময়ী ও ভাবময়ী করিয়া পূজা উপাসনার পদ্ধতি নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক তন্ত্রে দেবদেবীর মূর্তির বিবরণ আছে, সেই সকল মূর্তির উপর মাতৃত্ব পিতৃত্ব প্রভৃতি আসক্তির আরোপ আছে,—দেবীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহার স্তব স্তুতির ব্যবস্থা আছে। এই দ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তপূর্ণ তন্ত্রসকলের উপর আধুনিক বৈষ্ণব Deism বা ঈশ্বরবাদের প্রগাঢ় ছায়া যে পড়ে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। রামানুজাচার্যের পূর্বে যামুন মুনির সময় হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণাশ্রমী সমাজের এক অংশের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রামানুজাচার্য বিষম শঙ্করদ্বেষী, অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদকারী ছিলেন। বোধ হয় তিনিই এবং তাঁহার গুরু যামুন মুনি প্রথমে প্রকাশ্যভাবে শঙ্করাচার্যের সহিত বিরোধ ঘটাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী রামানুজাচার্যের জীবনকথা লিখিয়া যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, সেই পুস্তকে যামুন মুনির পূর্বে যে সকল ভক্ত বৈষ্ণবদিগের বর্ণনা দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না, বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত ছিলেন না; সবাই শূদ্র বা আদিম পঞ্চমজাতীয় পুরুষ ছিলেন। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে যামুন মুনির পূর্বে বৈষ্ণব ধর্ম—ভক্তির ও উপাসনার ধর্ম আর্য্য দ্বিজাতির ধর্ম ছিল না; দ্রাবিড়জাতীয় আদিম পঞ্চম জাতিসকলের

ধর্ম ছিল। শঙ্করাচার্যের সময়ে এবং তাহার পূর্বে শৈব ও শাক্ত ধর্ম, আর্য্যাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের উভয় দেশের বর্ণাশ্রমী সমাজের ধর্ম ছিল। তবে তন্ত্রের শাক্ত ধর্ম যে, আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, উহাতে যে বর্ণ বৈষম্য প্রকট কখনই ছিল না, এ কথাটা জোর করিয়া বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের দুইটি প্রধান শাখা ছিল—হীনযান এবং মহাযান। হীনযানের প্রভাব দাক্ষিণাত্যেই প্রবল ছিল; মহাযান আর্যাবর্তে ও উত্তরাখণ্ডে প্রবল ছিল। মহাযানী বৌদ্ধগণ তন্ত্রের শাক্ত ধর্মের সহিত আপোস করিয়া কালচক্রযান, বজ্রযান প্রভৃতি নানা শাখার সৃষ্টি করেন; বাঙ্গালার ও উত্তরাখণ্ডের ও কাশ্মীরের তান্ত্রিক শক্তিধর্ম তাই অনেক ক্ষেত্রে মহাযানের ছায়া অনুসরণ করিয়াছে। লক্ষ্মণাচার্যের লিখিত শারদাতিলক পাঠ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে রাঘব ভট্টের টীকা পড়িলে মনে এই ধারণাটা প্রবল হইয়া উঠে। আধুনিক তন্ত্রের সর্বাঙ্গে যে মহাযানের লেখা গাঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তান্ত্রিক শক্তিধর্ম যে মহাযান অপেক্ষা বহু পুরাতন, বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল, ইহাও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মে, অন্ততঃ রামানুজাচার্য্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে বৌদ্ধ হীনযানের বহু সিদ্ধান্ত যে খুঁজিলে পাওয়া যায়, তাহা মান্দ্রাজের অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। দক্ষিণের শৈবদিগের মধ্যে যে হীনযানের অনেক কথা প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ দক্ষিণামূর্তি শিবের উপাসনা ও হীনযানের সাধনা যে স্পষ্ট একই রকমের, একই দর্শনসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দক্ষিণের অভিজ্ঞ শৈব সন্ন্যাসী স্বীকার করেন। রামানুজাচার্য ছাড়া মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য ও নিম্বাদিত্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে হীনযানের অনেক পদ্ধতি আধুনিক হিন্দু আকারে আকারিত হইয়া প্রচলিত আছে। এই হীনযান ও মহাযানের পদাঙ্ক নানা আকারে পুরাণ ও তন্ত্রে এবং আধুনিক নানা সাম্প্রদায়িক ধর্মে বেশ স্পষ্ট আছে। ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই সকল বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা না করিলে ঠিক ইতিহাস লেখা হইবে না। আমাদের চারিদিকে যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিলেই আমাদের ধর্মপদ্ধতির শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস ঠিকমত পাওয়া যাইবে। পুরাণের এই সৃষ্টিপ্রকরণ ব্যাখ্যানের মধ্যে অনেক কথা, অনেক ইতিহাস লুকান আছে। ধর্মভাবোন্মেষের এক একটা পর্যায় এক একটা পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণে আংশিক

ভাবে নিবদ্ধ আছে। সে কথার আলোচনা বর্তমান সন্দর্ভে করিবার নহে, কেবল ইঙ্গিতে যতটুকু পারিলাম, ততটুকু বলিয়া রাখিলাম। মনে রাখা ভাল যে, আমরা এখনও আমাদের চিনিতে পারি নাই, আমরা যে কে ও কেমন, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই, বুঝিলে এবং চিনিলে, নিজের পরিচয়—নিজেদের পিতৃপরিচয় যথার্থ ভাবে জানিতে পারিলে, এ সকল কথা বলিবার কোন প্রয়োজন হইত না। আমি কেবল চিনিবার পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। মনে হয় এই পুরাণ তন্ত্রের পথে, আধুনিক আচার্যগণের প্রচারিত নব্য বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের পথে অগ্রসর হইলে আমরা আমাদের পূর্বপরিচয় পাইলেও পাইতে পারি। আমাদের শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মে, পুরাণ এবং তন্ত্রে বৌদ্ধ ধর্মের বহু সম্পত্তি লুকান আছে বলিলে লজ্জিত হইবার হেতু দেখি না। কারণ, বৌদ্ধ ধর্মও ত আমাদের ধর্ম, জৈন ধর্মও ত আমাদেরই ধর্ম ; বিদেশের নহে, ভিন্ন জাতির নহে। যাহা আমাদের, তাহা আমাদের মধ্যেই আছে ও থাকিবে। কারণ, হিন্দু আমরা কখনও কোন সামগ্রী পরিহার করি নাই, করিবও না ; আমরা যাহা পাই, তাহা নিজেদের মতন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করি। যাহা থাকে, তাহা থাকিয়াই যায়, যাহা পিছলাইয়া পড়ে, তাহা বিস্মৃতির গর্ভে একেবারেই ডুবিয়া যায়। এখন যাহা আছে, তাহার বাছাই করিতে পারিলে, আমাদের পূর্বপরিচয় আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তন্ত্রের মধ্যে এই পরিচয় লুকান আছে বলিয়াই, তন্ত্রধর্ম এক সময়ে বাঙ্গালী জাতির এবং বাঙ্গালা দেশের ধর্ম ছিল বলিয়াই এখনও তন্ত্রের প্রভাব আমাদের সামাজিক সকল কার্যে, ব্রত নিয়মে ফুটিয়া আছে বলিয়াই তন্ত্রের কথা এমন ভাবে বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে হইতেছে। তন্ত্র সাধনার ধর্ম ; যে জিজ্ঞাসু সৎগুরু লাভ করিয়া, যথাপদ্ধতি দীক্ষিত হইয়া জপ তপ করিতে পারিবে, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সেই তন্ত্রের সাধনধর্মের মহিমা বুঝিতে পারিবে। ভাষায় সে মহিমা বুঝান যায় না, প্রবন্ধ সন্দর্ভ লিখিয়া সে মহিমার ব্যাখ্যান সম্ভবপর নহে। তাই তন্ত্রের ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক দিকটাই ভাল করিয়া ফুটাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই জন্যই তন্ত্রের সকল বড় বড় সিদ্ধান্তের সহিত পুরাণের কি সম্বন্ধ, দর্শনশাস্ত্রের কতটুকু তন্ত্রের মধ্যে আসিয়াছে অথবা তন্ত্রসিদ্ধান্ত দর্শনশাস্ত্রে কতটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য অধিক প্রয়াস করিতে হয়।

এইখানে আর একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখিব। দেহসৃষ্টি এবং

বিশ্বসৃষ্টি একই পদ্ধতিক্রমে হইয়াছে, এই সাধারণ সিদ্ধান্তটা বা generalisation বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কামবজ্রযান নাম দিয়া একটা উপাসক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যখন পাঠানগণ এ দেশে প্রথম আগমন করেন, তখন বাঙ্গালায় এই সম্প্রদায়ের সাধকদিগের বেজায় প্রাবল্য ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সম্প্রদায়ের প্রচলিত দুই চারিখানি তন্ত্রগ্রন্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, উহা এতই কুৎসিত ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনায় পূর্ণ। তাঁহাদের মত এই যে, মনুষ্যদেহ যেমন কামের সাহায্যে সৃষ্ট বা উৎপন্ন, বিশ্বসৃষ্টিও তেমনি কামের সাহায্যে সৃষ্ট বা উৎপন্ন। কামে যেমন রেতঃস্খলন হয় এবং রজঃ ও রেতের সম্মেলনে জীবের সৃষ্টি হয়, তেমনি বিশ্বসৃষ্টি শক্তিসমন্বিত শিবলিঙ্গের রেতঃস্খলন হইতে উৎপন্ন। এই হেতু বিশ্বসৃষ্টিকে তন্ত্রে বিসৃষ্টি বা discharge বলিয়াছে। অর্থাৎ কামান্ধ বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি একটা স্খলন বা বিসৃষ্টি মাত্র। এই সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকগণের মত এই যে, যেমন যুবক যুবতী সদা রিরংসায় পূর্ণ থাকে, তেমনি বিশ্বব্যাপী শিব ও শক্তি সদাই নিত্য নব সৃষ্টির জন্য রিরংসায় পূর্ণ। তাঁহাদের নিত্য সম্মেলনে ক্ষণে ক্ষণে বিসৃষ্টি হইতেছে, ফুটিতেছে, উঠিতেছে, ডুবিতেছে, শুকাইতেছে। বিশ্বসৃষ্টির রিরংসা এবং জীবদেহগত রিরংসার সামরস্য ঘটাইতে পারিলেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। ইহারা তাই সদাই কামসাধনা করিত। ইহাদের অত্যাচারের প্রভাবে জাতিটা একেবারেই নিবীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। সাধনার দোহাই দিয়া ইহারা নির্লজ্জভাবে সমাজের সর্বাঙ্গে কামের প্রকট বিকাশ ঘটাইত। মন্দিরে, মঠে, দেবায়তনে, সর্বত্রই রিরংসার ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিত। কালাপাহাড় ইহাদের মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া, শেষে হিন্দুর সকল দেবমন্দিরই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। বিরূপাক্ষ নামের একজন হিন্দু তান্ত্রিক চৈতন্যদেবের সমসময়ে সাধনার প্রভাবে অনেক দেবদেবীর বিগ্রহ ফাটাইয়া দিয়াছিলেন। প্রবাদ এই ছিল যে, যে দেবদেবীর মধ্যে দৈব ভাব না থাকিত, সে দেবদেবীকে বিরূপাক্ষ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে তাহা ফাটিয়া যাইত। তাই কথা প্রচলিত ছিল যে, 'কালাপাহাড়ের ফাট আর বিরূপাক্ষের ফাট' অর্থাৎ কালাপাহাড়ের তলোয়ারের চোট এবং বিরূপাক্ষের বিগ্রহ ফাটাইবার প্রভাব, দুই দুর্নিবার্য্য ছিল। মোট কথা, এই বিরূপাক্ষ এই কামচক্রযানীদের বাঙ্গালা হইতে সমূলে নির্মূল করিয়াছিলেন।

আমার মনে হয়, জগন্নাথের শ্রীমন্দির এই কামচক্রযানীদের প্রভাবকালেই নির্মিত হইয়াছিল। বিমলার ক্ষেত্র কামযানীদের পুণ্যক্ষেত্র ছিল। মজা এই যে, ভারতবর্ষের সকল তীর্থে যেখানে শক্তির মন্দির আছে, সেইখানেই পার্শ্বে শিবমন্দির ভৈরবরূপে বিদ্যমান আছে। অথচ শ্রীক্ষেত্রে বিমলার ভৈরব স্বয়ং জগন্নাথ, কোন শিব নহে। কামচক্রযানীরা বৌদ্ধ ছিল, তাহাদের শিব অবলোকিতেশ্বর, তাহাদের ভৈরব স্বয়ং বুদ্ধদেব। বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, এই তিন লইয়া জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা হইয়াছেন; সুতরাং বিমলার ক্ষেত্রে জগন্নাথই ভৈরব। বৌদ্ধ তন্ত্রে সঙ্ঘ চক্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। সঙ্ঘে জাতিবিচার নাই, চক্রেও জাতিবিচার নাই। কেবল তাহাই নহে, সঙ্ঘে যোনিবিচার নাই, চক্রেও যোনিবিচার নাই। ইহা বিমলাক্ষেত্রে যতটা পরিস্ফুট, এতটা অন্য কুত্রাপি নহে। আমি এখনও সকল পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সকল পুঁথি দেখিতে পাই নাই, তথাপি যতটুকু পড়িয়াছি ও তাহা হইতে জগন্নাথের শ্রীমন্দির নির্মাণ বিষয়ে একটা theory বা মতলব আঁটিতে পারিয়াছি। আমার প্রিয় সুহৃদ্ মনীষী শ্রীমান্ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামক অপূর্ব পুস্তকে শ্রীমন্দিরের কুৎসিত ছবি লইয়া একটা theory করিয়াছেন, পাঠকগণকে তাহার পরিচয় দিয়া রাখিয়াছি। এইবার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতে পারিলে আমি আমার theory সাধারণের বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। এখন এইটুকু বলিয়া রাখিলে পর্যাপ্ত হইবে যে, কামযানীদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বিশ্বসৃষ্টির প্রতিমারূপে শ্রীমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বিশ্বসৃষ্টি এবং দেহসৃষ্টির সমরসতা এই শ্রীমন্দিরেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অশ্লীল ছবির মধ্যে পুরুষ মাত্রেই কামযানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, নারী মাত্রেই দেবদাসী অথবা ভিক্ষুণী। মন্দিরটা আগাগোড়া বৌদ্ধ কামযানীদের principles বা মতানুসারে নির্মিত। দেশীয় ভাস্কর্য পদ্ধতির উপর সৃষ্টিতত্ত্বের অর্থবাদ পাষাণের লেখায় ফুটান আছে। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে আমাদের জাতির একটা যুগের ধর্মমতের ইতিহাস ও রীতি পদ্ধতি লুকান আছে। যে দিন ঐ মন্দিরের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে, সেই দিন জাতির ইতিহাসকথা জানিতে পারিব।

তন্ত্রের দেহতত্ত্ব

যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ 'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।' ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া সকলে তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্ত্রের এই ব্যাখ্যা পুরাণাদি নানা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন। তাই পুরাণ ও তন্ত্র, সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকথা দেহতত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। এই দেহতত্ত্ব আনুসারিক ব্যাখ্যাকে অনেকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নাম দিয়া থাকেন। যাহা খাঁটি ইতিহাস নহে, সত্য ঘটনার পুনরুল্লেখ নহে, যাহা উপাখ্যান এবং আখ্যায়িকা, যাহা সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যার রোচকস্বরূপ, সে সকলেরই দেহতত্ত্ব অনুসারে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর। এই হেতু মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দেহতত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা সুধী-সমাজে প্রচলিত আছে।

তন্ত্রের প্রায় সকল সাধনা ও আরাধনার দুইটা দিক্ আছে; একটা বাহিরের বা বিশ্বতত্ত্বের দিক্, অপরটা ভিতরের বা দেহতত্ত্বের দিক্। সকল সিদ্ধিরই বিকাশের দুইটা দিক্ আছে, একটা জগতের বা বাহ্য প্রকৃতির দিক্, অপরটা ভিতরের বা দেহগত প্রকৃতির দিক্। তুমি আত্মশক্তি বিকাশের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পার, অথবা বাহ্য শক্তি আয়ত্ত করিয়া আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পার। সিদ্ধির ব্যাঘাত বাহিরের শক্তির দ্বারা হইতে পারে, ভিতরের কাম ক্রোধ লোভাদি দ্বারাও হইতে পারে। শক্তির অভিব্যঞ্জনা বাহিরেও যেমন হয়, ভিতরেও সেই পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। সেই হেতু তান্ত্রিক সাধক মাত্রেই সাধনার দুইটা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন; এক—মানস পূজা, অন্তর্যাগ প্রভৃতি মানস পূজা-পদ্ধতি; দ্বিতীয়—বাহিরের পূজা পাঠ, যোগ যাগ, সাধনা আরাধনা প্রভৃতি। তন্ত্র বলিতেছেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একই ভাবে নানা শক্তির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল, সহায়ক হইবে। তুমি ব্যোমযান বা এরোপ্লেন চড়িয়া তাহার সাহায্যে উড়িতে পার; আবার দেহের সাহায্যে খেচরী সিদ্ধি লাভ করিলে তুমি বিনা ব্যোমযান বা এরোপ্লেনে বিমানপথে উড়িয়া যাইতে পার। যে শক্তির সহায়তা লাভ

করিবার জন্য তোমাকে ব্যোমযান বা এরোপ্লেন গড়িতে হয়, খেচরী সিদ্ধি হইলে সেই শক্তি তোমার দেহের আকর্ষণে তোমার দেহে ব্যাপ্ত হইয়া তোমাকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। ইউরোপের যান্ত্রিকগণ যন্ত্রের সাহায্যে বাহিরের শক্তিকে বশে আনিবার চেষ্টা করেন, দেহগত আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনে বিশেষ তৎপর হন না ; ভারতবর্ষের তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষগণ আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তিকে বশে আনয়ন করেন। এ দেশের সিদ্ধগণ বলেন যে, মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই ; এমন যন্ত্র আর কেহ গড়িতে পারে না, এমন যন্ত্র নির্মাণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব এই যন্ত্র সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে, অন্য কোন স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। বিনা তারের টেলিগ্রাম চলিতেছে বটে, কিন্তু এখনও দুইটা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তোমাদের দেহ যদি ঠিকমত প্রস্তুত থাকিত, তাহা হইলে বিনা তারে এবং বিনা স্বতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা বহু দূরে থাকিলেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাইতে পারিতে। প্রকৃতির গুপ্ত শক্তিসকলের সহিত দেহের গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বা কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায়, ইহা যে সাধনার ফলে জানা যায় বা আয়ত্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই তন্ত্রসাধনার মূল হইল দেহতত্ত্ব। তাই দেহের কথা লইয়া তন্ত্র আগাগোড়া ব্যস্ত।

ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহভাণ্ডের সাম্য ভাব দেখাইবার জন্য তন্ত্র বলিতেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদি নব গ্রহাঃ ॥
নাগাশ্চ সর্বদেহিনাং পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পাদাধস্তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা ॥
জান্বনোঃ সুতলঞ্চৈব তলঞ্চ সন্ধিরন্ধ্রকে।
তলাতলং গুল্‌ফ মধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলং ॥
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্বুধঃ।
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি ॥
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি।
জনলোকস্তদতঞ্চ তপোলোকো ললাটকে ॥

সত্যলোকো মহামোনৌ ভুবনানি চতুর্দশ।
ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরু রুদ্রলোকে চ মন্দরঃ॥
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ।
বিন্ধ্যো বিষ্ণুস্তদূর্দ্ধে চ সপ্তেতে কুলপর্ব্বতীঃ॥”

এই ভাবে পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনায় যেখানে যাহা ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাই যে মনুষ্যদেহে বিদ্যমান, তন্ত্র তাই দেখাইতেছেন। মনুষ্য দেহভাণ্ড যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার, ইহাই তন্ত্র বলিতে চাহেন। কেবল তাহাই নহে। তন্ত্র ইহাও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, পুরাণে হর-গৌরীর, কৃষ্ণ-রাধিকার যে সব লীলা উপাখ্যানের আকারে বর্ণিত আছে, তাহা দেহগত স্ত্রীত্ব ও পুংত্বের নানা লীলার বাহ্যিক অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই দেহেতেই কৈলাস, এই দেহেতেই হিমালয়,—এই দেহেতেই শ্রীবৃন্দাবন, এই দেহেতেই গোবর্দ্ধন;—এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণরাধিকা নানা লীলানাট্য প্রকাশ করিতেছেন। তাহাই গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের নিত্যলীলা, তাহাই একাম্রকাননে উমার খেলা। দেহতত্ত্বের এই গুপ্ত রহস্যটুকু বুঝাইবার জন্যই তন্ত্র কথাটা এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুরাণের বহু কাহিনী যে দেহতত্ত্বের কথা, তন্ত্রের এই কুঞ্চিকা ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্যে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বাঙ্গালার সহজিয়াগণ এবং তাঁহাদের সিদ্ধাচার্যগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেহতত্ত্বের গুপ্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বৈতবাদীই কি, আর অদ্বৈতবাদীই কি, যাঁহারা সাধনপরায়ণ, শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে তৎপর, তাঁহারাই দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কারণ, সাধক মাত্রেই আত্মার উপাসক; দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে নানা রসের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডাবচ্ছিন্ন আত্মার সহিত তাঁহারা মিশাইতে চাহেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্মেলন চেষ্টাই সাধনা। এই সম্মেলন রসের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে এবং দেহগত শক্তি-বিশেষের উন্মেষ সাধনেও ঘটিয়া থাকে। ভক্তি ও ভাবের সহায়তায় রসের উন্মেষ হয়, ষট্‌চক্রভেদ, শব সাধনা প্রভৃতির দ্বারা শক্তির উন্মেষ হয়। যাঁহারা রসিক এবং ভাবুক, তাঁহারা শক্তির সহায়তা গ্রহণ করেন; যাঁহারা খাঁটি শাক্ত, তাঁহারাও প্রয়োজন হইলে রসের ও ভাবের সহায়তা গ্রহণ করেন: লীলা ও নাট্যের সাহায্যে বিকাশ হয়; কেবল সাধনা করিলে শক্তির বিকাশ ঘটে। উভয়েই উভয়ের সহায়ক; শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাটা আগাগোড়া দেহতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া ব্যাখ্যা করা যায়। কুমারসম্ভব এবং হর-গৌরীর

লীলাটাও দেহতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, আগাগোড়া দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা মাত্র; এই দেহের মধ্যেই দেবাসুরের সংগ্রাম; মহিষাসুর, মধুকৈটভ, শুম্ভ নিশুম্ভ দেহেই আছে; এই দেহের মধ্যেই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি নানা রূপ ধরিয়া অসুর নাশ করিয়া থাকেন। যাহার কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতে জানে, তাহারাই সপ্তশতীর সকল ঘটনা ও প্রত্যেক আখ্যায়িকা দেহের ভিতরের শক্তির লীলার সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারে। এই দেহতত্ত্বের মাপকাঠি লইয়া পরে গীতারও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

আসল কথা, আমরা আমাদের পুরাণ তন্ত্রের ভাষা বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছি; কোন্ শব্দের কোথায় কেমন দ্যোতনা, কেমন ভাবে কোন্ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সে খবর আমাদের নাই। পুরাণ তন্ত্রে প্রযুক্ত নানা শব্দের পারিভাষিক অর্থ আমাদের জানা নাই। তাই পুরাণ তন্ত্রের অনেক কথা এখন আমাদের গাঁজাখোরি বলিয়া মনে হয়। উহার যে কোনটাই গাঁজাখোরি নহে—উদ্ভট, অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, তাহা দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ জানিতেন এবং বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। যাঁহারা নানা দর্শনের স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা, তাঁহারা যে সমাজশিক্ষার জন্য উদ্ভট ও উৎকট কথার প্রচার করিবেন, ইহা মনে করিলেও পাপ আছে। শ্রীচৈতন্যের তুল্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও দার্শনিক কেন যে বৃন্দাবনলীলায় আস্থা স্থাপন করিতেন, কেন যে সে লীলার কথা মনে করিলে ভাবাবেশে অধীর হইতেন, তাহা ত ভাবিয়া দেখিতে হয়। বাহিরের উদ্ভটতা ও উৎকটতা ছাড়া উহার ভিতরে যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীমন্নিত্যানন্দ, জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহামহাপণ্ডিতগণ ভাবে বিহ্বল হইতেন, এইটুকু মনে না করিলে এই সকল দিগ্বজয়ী পণ্ডিতগণের প্রতি অবিচার করা হয়। ইদানীং এই ইংরেজের আমলেও যাঁহারা একবার দেহতত্ত্বে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা অমনি পুরাণ তন্ত্রের সকল উদ্ভট গল্পে ও কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করিয়া ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন। একটা উদাহরণ কথা শুনাইব। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘোর ব্রাহ্ম ছিলেন; কিন্তু যাই সাধনার পথে অগ্রসর হইলেন, যেই দেহতত্ত্বের গুপ্ত কথা তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটিতে লাগিল, অমনি তিনি লীলা শ্রবণ করিলে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তখন আর তাঁহার বুদ্ধিতে পুরাণের লীলা

আখ্যানের মধ্যে উদ্ভট উৎকট গাঁজাখোরি বলিয়া কিছু মনে হইত না—গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয়দমন, পূতনাবধ, রাসলীলা প্রভৃতি কোনটাই উদ্ভট বা গাঁজাখোরি বলিয়া মনে হইত না। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের, শ্রীযুত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার, এবং সদ্গুরুর আশীর্বাদে ধন্য আরও অনেকের এখন আর পুরাণকথা, শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যান অংশ বা চণ্ডীর লীলা উদ্ভট উৎকট বা গাঁজাখোরি বলিয়া মনে হয় না। যে এক বার ভিতরের কথা বুঝিবে, দেহতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের প্রহেলিকার মর্ম্ম জানিতে পারিবে, যে এক বার সদ্গুরুর কৃপায় সাধনার এবং আরাধনার অপূর্ব রসাস্বাদনে ধন্য হইবে, সে-ই আর পুরাণ তন্ত্রকে, আখ্যায়িকা উপাখ্যান সকলকে, লীলা ইতিহাসকে গাঁজাখোরি ব্যাপার বলিতে সাহস পাইবে না। সে-ই পুরাণ তন্ত্রের ভাবে মজিবে, রসে ডুবিবে। দেহতত্ত্ব পুরাণ তন্ত্রের কুঞ্চিকাস্বরূপ। যিনি দেহতত্ত্ব জানেন না, তিনি পুরাণ তন্ত্র, ভাগবতী লীলা নাট্য, কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, আমাদের শাস্ত্রের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবেন। কেবল ভাষার সাহায্যে ঠিকমত দেহতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব বুঝান যায় না; সঙ্গে সঙ্গে সাধনশীল না হইলে উহার মর্ম্ম বুঝা কঠিন। যেমন যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না, তাহাকে ঢেউয়ের উপর ভাসিবার সুখটা কেমন, তাহা যেমন বুঝান যায় না, তেমনি দেহতত্ত্বের দার্শনিক হিসাবে বিশ্লেষণ করিয়া যতই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা কর না কেন, যে কর্মী নহে, সাধক নহে, সে কিছুতেই ঠিকমত বুঝিতে পারিবে না। এ সকল বিষয়ের একটা স্বতন্ত্র অনুভূতি থাকা প্রয়োজন, একটা সংস্কার থাকা প্রয়োজন। যাহার সঙ্গীতের কান নাই, স্বরবোধ নাই, সে যেমন কড়ি কোমলের মজা বুঝে না, তেমনি যাহার সাধনার সংস্কার নাই, সে চিরজীবনটা দেহতত্ত্বের ও রসতত্ত্বের কথা শুনিতে থাকলেও উহার মজাটা সে কিছুতেই পাইবে না। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—সাধনার কথা, রসতত্ত্বের কথা যাহার তাহার কাছে বলিবে না; বাজে লোকে এ সকল কথা শুনিলে নাস্তিক হইয়া উঠিতে পারে, উহার প্রকৃত রসটুকু বুঝিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে। এই হেতু তন্ত্র বলিতেছেন,—

'চরাচরমিদং দেবি সর্বং কর্মাত্মকং প্রিয়ে।
মাতা কার্য্যং পিতা কর্ম কর্মৈব পরমো গুরুঃ॥
কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে॥

যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শুভাশুভং কর্ম কর্তারমনুবিন্দতি ॥'

অর্থাৎ হে দেবি, এই চরাচর সকলই কর্মাত্মক; মাতাই কার্য্য, পিতাই কর্ম; কর্মই পরম গুরু অর্থাৎ কর্মের দ্বারা জীব, মাতৃপিতৃলাভ করিয়া থাকে, কর্মই সাধকের গুরুস্বরূপ। এই কর্ম দ্বারাই জীব জন্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। একটা কর্মপরম্পরা শেষ হইলে একটা দেহের নাশ হয়, আবার অভুক্ত কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্যে নূতন দেহ ধারণ করে। যেমন মাঠে সহস্র গো এবং বৎস বিচরণ করিতেছে; কে কাহার বৎস, তাহা তুমি আমি চিনিতে পারি না, পরন্তু বৎস নিজের জননীকে চিনিয়া ঠিক বাহির করে, তেমনি শুভাশুভ কৃত কর্ম কর্তাকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নূতন দেহের সৃষ্টি করে। এই কর্মাত্মক দেহাভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী বিরাজ করেন এবং কর্মানুসারে জীবকে পাপ পুণ্যের ভাগী করিয়া থাকেন। রেশমের গুটি যেমন গুটিপোকা নিজেই গড়িয়া তোলে, তেমনি আমাদের দেহ আমরা নিজের কর্মানুসারে গড়িয়া তুলি। এই দেহ কেমন?

'আদৌ সংজায়তে বীজং ব্রহ্মাণ্ডৈঃ সহ সাঙ্কুরং।
তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ ॥
চরাচরাণাং সর্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ।
আলয়ঃ সর্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ ॥
প্রদীপকলিকাকারো জীবো হৃদি সদা স্থিতঃ।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ ॥

অর্থাৎ প্রথমে ভ্রূণের দেহেতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ অঙ্কুরাকারে বীজের উৎপত্তি হয়, সেই দেহের মধ্যে সুমেরুর ন্যায় কঙ্কালের দণ্ড বা পিঠের দাঁড়া তৈয়ার হয়। ইহারই মধ্যে সর্বচরাচর, দেব দেবী, এবং সর্বভূতের আলয় ন্যস্ত থাকে। এইখানেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী সৃষ্টিশক্তির লীলা বিকাশ হইয়া থাকে। এই মেরুদণ্ডের মধ্যেই সপ্ত লোকের অবস্থিতি আছে। এইখানেই সূর্য্যচন্দ্রের বিকাশ, স্বর্গনরকের খেলা, দেবাসুরের লীলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার এই দেহভাণ্ডে জীবাত্মা প্রদীপকলিকার ন্যায় হৃৎস্থানে বাস করেন। রজ্জুবদ্ধ শ্যেনপাখী যেমন রজ্জুর আকর্ষণে আবার পূর্বস্থানে আসে, তেমনি জীবাত্মাও দেহাবচ্ছিন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ দেহেআকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

এই দেহস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি সাধকের রুচি অনুসারে স্ত্রী বা পুরুষরূপ ধারণ করেন। এবং সেই রূপ অনুসারে তাঁহার লীলার বিকাশ হইয়া থাকে। এই কুণ্ডলিনীর স্ত্রীরূপ লীলায় কালী, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, কামাখ্যারূপিণী, মাতঙ্গী, শৈলসুতা, তারা, উমা, গিরিজা, বৈষ্ণবী প্রভৃতি অনন্ত রূপ আছে, এবং অনন্ত রূপে এই দেহের মধ্যে অনন্ত লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলিনী পুংরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দশাবতার, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বিভূতির বিকাশ করিয়াছেন। পুংদেবতার লীলাও দেহাভ্যন্তরে চক্রে চক্রে হইয়া থকে। সেই সকল লীলার কথা নানা পুরাণে এবং ব্যাখ্যান-পুস্তকে প্রকট হইয়াছে। তন্ত্র এমন কথা বলিতেছেন না যে, এই সব ভাগবতী লীলার ইতিহাসকথা নাই, পরন্তু সে সব ইতিহাসকথা অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র। যেমন শ্রীরাম কর্তৃক রাবণবধ ইতিহাসকথা এবং ঐ রাবণবধের হেতু শ্রীরামচন্দ্রকে জনসাধারণ ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করে। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক কংসবধ, ভারতযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা তাঁহাদের বিভূতির প্রকাশক, অবতার বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের খ্যাতির খ্যাপক। পরন্তু দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়াও উঁহাদের ঐ সকল ঘটনার সার্থকতা আছে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নির্ভাঁজ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যান মাত্র, উহার সার্থকতা দেহতত্ত্বের মাপকাঠির সাহায্যে বুঝিতে হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রকৃত মর্ম দেহতত্ত্বের সাহায্যে বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে কর্মবাদ বুঝিতে হইবে;—কোন্ কর্মের প্রভাবে কেমন দেহ ধারণ করিলে, সে দেহে দেব ও অসুরের লীলা কেমন ভাবে হইতে পারে, তাহা জানিতে হইবে। তাহার পর তন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারে শক্তির লীলাবিকাশ নিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার এই দেহের মধ্যে কোথায় কোন্ স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তির কেমন খেলা হইতেছে, তাহা জানিতে হইবে। তখন বুঝিবে—'মদমত্ত মাতঙ্গিনী কে রমণী নেচে যায়,' 'কার স্পর্শে নাচে রে, রণে উলঙ্গিনীবেশে' প্রভৃতি মহাজনরচিত সঙ্গীতকলের মর্ম কি। শেষে রসতত্ত্বের কথা, ভাবের কথা, ভক্তির কথা আপনা আপনি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। তখন বুঝিবে—বাঞ্ছাকল্পতরুর প্রকৃত অর্থ কি;—সে তরু কোথায় থাকে, সে তরুতলে কে বসিতে পায়, কাহার কেমন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এ সকলের প্রকৃত অর্থ জানা যাইবে। ভাষার নানাবিধ অলঙ্কারের আবরণে যে আমাদের পুরাণ তন্ত্র কত মজার ও রসের কথা লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা

এ ব্যাপারে যে না ডুবিয়াছে, সে বুঝিতে পারে না। এই দেহের মধ্যেই সর্বতীর্থ, সকল নদ নদী, সকল পর্বত সাগর বিদ্যমান; এই দেহের মধ্যে সকল দেবতার সকল লীলা নিত্য হইতেছে। এই দেহ যেমন আমাদের কর্মক্ষেত্র, আমাদের জন্মভূমি ভারতভূমি, তেমনি আমাদের কর্মক্ষেত্র। দেহক্ষেত্রের সহিত জন্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সমতা রক্ষা করিবার জন্য, দেহের মধ্যে যেমন কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, পুরীধাম প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র আছে, তেমনই পুণ্যতীর্থসকলের বিন্যাস যথাসম্ভব ভারতবর্ষের সর্বত্র করা হইয়াছে। দেহের তীর্থে তীর্থে কুণ্ডলিনীকে লইয়া যাইয়া স্নান দান করাইলে যে অপূর্ব ফলোদয় হয়, বাহিরের কাশী গয়া আদি পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থ করিতে যাইয়া দান পূজা করিলে সেই ফলশ্রুতি লিখিত হইয়াছে। দেহের যে স্থানে গদাধরের পাদপদ্ম গয়াক্ষেত্র, সেইখানে পিণ্ড দিলে, কুণ্ডলিনীর সাহায্যে বীজগর্ভদোষের পরিহার করিতে পারিলে, দেহগত পৈতৃক ধারার বিমুক্তি বা পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক সাধকের পক্ষে পিতৃধারার শোধন বা বিমুক্তি অবশ্য কর্তব্য, প্রত্যেক গৃহস্থ হিন্দুর পক্ষে গয়ায় পিণ্ডদান অবশ্য কর্তব্য। ইঙ্গিতে ইসারায় কত আর বলিব! সাধক যে ভাবে যাহা বুঝিয়া থাকেন, যে ভাবে বুঝিতে পারিলে শাস্ত্রতত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, তাহা যতটুকু পারা যায়, ইঙ্গিতে বলিয়াছি। আসল কথা, আমাদের শাস্ত্র—আমাদের সাধনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে,—

'ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখনো,
দুই চার ডুবে ফল না পেলে।'

ইহা ছাড়া অন্য পন্থা নাই, অন্য সোজা পথ নাই।

কাম ও মদন

১

কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সকলকেই হিন্দুর সাধনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে কাম ও মদন, এই দুইটির মূল অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। ইংরেজী পড়িয়া, খ্রীষ্টানি সিদ্ধান্তে বিভোর হইয়া কাম ও মদন বলিলেই আমরা এখন রিরংসার ভাবটাই বুঝিয়া লই। উহাতে যে রিরংসা নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু রিরংসা ছাড়া উহাতে আরও অনেক ভাব, অনেক ব্যাপার আছে। সেই সকল বিষয়ের পূর্ণ উপলব্ধি না হইলে তান্ত্রিকী উপাসনা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধুর রসের সাধনা এবং প্রেমতত্ত্ব, কিছুই বুঝা যাইবে না। কেবল তাহাই নহে, কাম ও মদনতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদে আমরা বঞ্চিত থাকিব। তাই কাম ও মদনতত্ত্বের আমি যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারই একটু পরিচয় পাঠকগণকে দিব। বলিয়া রাখা ভাল যে, শাস্ত্রের গণ্ডীর বাহিরের কোন সিদ্ধান্তের উল্লেখই আমি করিব না; কেবল বাহুল্যভয়ে পদে পদে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতে পারিব না।

এক আমি বহু হইব, এই কামনা হইতেই সৃষ্টির উৎপন্ন। 'সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্'—ইহাই শ্রুতিবাক্য। এই কামনার ইচ্ছা তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান; কখন বা উহা ফুটিয়া উঠে, কখন বা উহা সম্মূঢ় অবস্থায় থাকে। এই কামনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে রসময় বলা হয়। 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রসস্বরূপ। রস বলিতে আমরা এখন বুঝি খেজুররস, ইক্ষুর রস,—একটা জলীয় কাথ মাত্র। কিন্তু রসের কেবল সে অর্থ নহে। রস তাহাই, যাহার সাহায্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রস, বিপরিণামের সহায়ক শক্তি মাত্র। তাই কেমিষ্ট্রীকে রসায়নবিদ্যা বলা হয়; পারদকে রসপ্রধান বলা হয়; কারণ পারদের সাহায্যে বহু ধাতুর অবস্থান্তর ঘটান যায়। তিনি রসময়; কেন না, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল আকার ধারণ করিতে পারেন, অসংখ্য অবস্থান্তর লাভ

করিতে পারেন। তিনি রসময়,—কেন না, বিশ্বসৃষ্টির এই অনন্ত বৈচিত্র্য তাঁহারই ইচ্ছাসঞ্জাত; তিনি সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়া সে বিচিত্রতার বাহার ফুটাইতেছেন বলিয়া তিনি রসময়। তিনি রসময়; কেন না, তিনি এক হইতে দুই, দুই হইতে অনন্ত কোটিতে নিজেকে ছড়াইয়া বিলাইয়া দিতে পারেন। তিনি রসময়; কেন না, তিনি এই বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্রতাকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া রাখিতে পারেন। তিনি এক হইতে বহু এবং বহু হইতে একে বিপরিণতির কর্তা বলিয়া তিনি রসময়। রসের এই মূল অর্থ ধরিয়া, পরে পদার্থ মাত্রেরই নির্যাসক রস বলিয়া সাধারণ্যে গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছে। মূলে কিন্তু বিবর্তনের শক্তিকেই রস বলা হইয়াছে।

যে শক্তির দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার ঘটে, তাহাকেই আদি রস বলে। এক আমি বহু হইব, ইহাই আদি রসের মূল সূত্র। তেমনই আমাদের রসায়নশাস্ত্রে যে পদার্থের সাহায্যে অন্য একটা পদার্থের বিবর্তন সম্ভবপর হয়, তাহাই তাহার আদি রস বলিয়া পরিচিত। যেমন তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইলে পিত্তল হয়, পিত্তলের আদি রস দস্তা। কারণ, তামার সহিত সোনা বা চাঁদি, লোহা বা পারা মিশাইলে পিত্তল হয় না; সুতরাং পিত্তলরূপে বিপরিণতির পক্ষে দস্তাই উহার আদি রস।

মনুষ্যদেহে বিপরিণতিসাধক অনেক প্রকারের শক্তি বা আসক্তি আছে। সে সকল শক্তির মধ্যে যে শক্তির সাহায্যে মনুষ্য এক হইতে বহু হইতে পারে, তাহাই দেহজাত আদি রস। প্রথমে শিশু বিভোর বিভ্রান্ত ভাবে ভূমিষ্ঠ হয়; ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যে যে শক্তির প্রভাবে তাহার শৈশব, পৌগণ্ড, বাল্য, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্ধক্য, জরা প্রভৃতি নানা পরিবর্তনের প্রকাশ হয়, সেই সেই শক্তি তাহার দেহগত নানা রস বলিয়া পরিচিত। তন্ত্র, দেহের এই সকল পরিবর্তনকে ঠিক chemical changes বা রাসায়ণ বিবর্তন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; রসায়নশাস্ত্রের পরিভাষায় দেহগত রসায়নের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশ্বব্যাপী আত্মা, যেমন রসের প্রভাবে বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্র লীলা প্রকট করিতেছেন,—নাটের গুরু নটবর তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যেমন পরিব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও মাধুর্যের বিকাশ করিতেছেন, তেমনি দেহগত আত্মা শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য আদির উন্মেষ ঘটাইয়া দেহমন্দিরে বসিয়া অপূর্ব লীলা বিস্তার করিতেছেন। যে কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন বিশ্বসংসারে নিত্য বিদ্যমান, সেই কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন

দেহভাণ্ডে নিত্য বিদ্যমান ; উভয়ের ক্রিয়া এক রকমের, উভয়ের প্রভাব এক প্রকারের। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহাই আছে দেহভাণ্ডে। বিশ্বাত্মা রসময়, দেহগত আত্মাও রসময়। বিশ্বব্যাপী আত্মা যেমন এক হইতে বহুতে পরিণত হইতে চাহেন, দেহগত আত্মাও তেমনি এক হইতে বহুতে বিস্তৃত হইতে চাহেন। বাহিরের আদি রস এবং ভিতরের আদি রস, দুই এক ও অভিন্ন, কেবল উহাদের অভিব্যঞ্জনা কিছু স্বতন্ত্র রকমের।

কঠোর সংযমী তপস্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তন্ত্র বলিতেছেন যে,—দেখ দেখ, সৃষ্টির উন্মেষ-ভঙ্গীটা এক বার দেখ। প্রথমে একটা রক্তের ডেলা ত ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার পর তাহাকে স্তন্য পান করাইয়া, আহার যোগাইয়া সে পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত হয়, তাহা হইতে আবার নূতন নূতন মনুষ্যের সৃষ্টি হয় কেন —কে জানে? কিন্তু তথাপি হয়। কেবলই কি হয়? পিতামহ ও মাতামহকুলের ঊর্ধ্বতন ঊনপঞ্চাশ পুরুষে পরিলক্ষিত নানা বৈশিষ্ট্যসমেত হইয়া উৎপন্ন হয়। একটা অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বনস্পতি গগন ভেদ করিয়া উচ্চে উঠে ; তাহাতে কত ফুল, কত ফল জন্মায়, কত শোভা, কত মাধুর্য ফুটিয়া উঠে, তাহার পর অমনই কত অগণিত নূতন বৃক্ষের বীজ তাহা হইতে সঞ্চয় করা যায়। এক আমি বহু হইবার কামনা নিসর্গসুন্দরীর সর্বাঙ্গে যেন নিত্য সর্বক্ষণ ফুটিয়া রহিয়াছে। সৃষ্টিমাধুরীর এই বিচিত্র শোভা, এই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত কর্মপরম্পরা তোমার সংযম তপস্তার অন্ধতমসাবৃত পথে পাওয়া যাইবে না। চোখ চাহিয়া না দেখিলে ইহার মহিমা কতকটা বুঝা যাইবে না। যখনি মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হই, তখন বেদনা পাইয়া কাঁদিয়া উঠি, তখন একটা জীব দুই ঠাঁই হয়, বোধ হয় তখনই আমার অস্তিত্বের জ্ঞান বিদ্যুদ্বিকাশবৎ ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠে। তাহার পর গর্ভজাত যন্ত্রণা পাসরিবার কালে, তিন মাস পর্যন্ত যেন মহাঘোরে বিভোর থাকি। শেষে মায়ের মুখ দেখিতে দেখিতে, মায়ের স্তন ধরিয়া পীযুষধারা পান করিতে করিতে, হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে আমার আমিত্বের অধ্যাসটা ধীরে ধীরে দৃঢ় হইয়া যায়। তখন বুঝি—আমি এক জন। সেই এক জন হামা দেয়, খেলা করে, কাঁদে, পরে চলিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে শিখে, বস্তুর পার্থক্য ও দূরত্ব অনুভব করিতে শিখে এবং ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠে। এই মানুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহার দেহের কত শোভাই ফুটিয়া উঠে। সেই শোভার আকর্ষণে, চিত্তবৃত্তির মোহের প্রেরণায় সে অপর

সকলকে নিজের দিকে টানিয়া আনে এবং আরও কত নূতন সৃষ্টির সূচনা করে। অহরহঃ সর্বত্র এবং সর্ববিষয়ে এই এক আমি বহু হইবার ক্রিয়া চলিতেছে। জীবদেহ হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহা হইতেই জীবের সৃষ্টি হয়, —কীট পতঙ্গ, অণু পরমাণুর মত জীবাণু যে কত অসংখ্য ফুটিয়া উঠে,—দেহের ভিতরে বিচরণ করে এবং দেহের বাহিরে উড়িয়া বেড়ায়, তাহার আর হিসাব করা যায় না। ইহাই সৃষ্টিপ্রহেলিকা, লীলাপ্রহেলিকা; এ প্রহেলিকা বুঝিবার নামই সাধনা, আরাধনা, উপাসনা—এই প্রহেলিকা বুঝিবার চেষ্টাতেই পদার্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণকে পরীক্ষা, সমীক্ষা, প্রতীক্ষা, অন্বীক্ষা প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে হয়। কেবল চোখ বুজিয়া থাকিলে সাধনা হয় না। এক বার নয়নময় হইয়া দেখ,—দেখার মতন দেখ।

তন্ত্র এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত নহেন। তন্ত্র বলেন যে,—যে রসের প্রভাবে রূপের বিকাশ, মোহের বিকাশ, শেষে এক হইতে বহুর বিস্তৃতি, সেই রসই আদি রস, এবং সেই রসের সাহায্যে যে সাধনা, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই আদি রসের বহিরঙ্গের সাধনার ফলে রসায়ন, জ্যোতিষ, শিল্পকলা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের ও বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই আদি রসের অন্তরঙ্গের সাধনার ফলে তন্ত্রের প্রায় সকল আরাধনার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবের মধুর রসের সাধনা এবং প্রেমের পথের আরাধনা এই আদি রসের অন্তরঙ্গ সাধনার একটা প্রকারান্তর মাত্র। তন্ত্র বলেন যে, এই আদি রস হইতে রিরংসার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া উহার নিন্দা করিও না। বিশ্বসৃষ্টিতে নিন্দার বা পরিহারের কিছুই নাই। যাহা তোমার উপযোগী নহে, তাহা তোমার পরিহারযোগ্য হইলেও, অন্য কোটি জীবের নহে। রিরংসা না হইলে যখন সৃষ্টি সম্ভবপর নহে; স্থাবর, জঙ্গম—বিশ্বসৃষ্টির সর্বস্বে যখন রিরংসা দেদীপ্যমান, তখন উহাকে পরিহার করিতে নাই, উহার নিন্দাও করিতে নাই। উহার মধ্যে কি গুপ্ত তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর, কোন্ কোন্ শক্তির প্রেরণায় উহার বিকাশ হয়, তাহা বুঝ; তবে ত সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে না পারিলে নিজেকে—দেহগত আত্মাকে ঠিক বুঝিতে পারিবে না। আত্মপরিচয়ই সাধনার শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। প্রথমে আত্মার বাহিরের বিকাশ বুঝ, তবে ভিতরের লীলা বুঝিবে; প্রথমে ব্যাহৃতি দেখ, তবে সংহৃতি বুঝিবে। শিশু যাহা দেখে, তাহাই শিখে; বালক ও কন্যা দুই জনই মাকে দেখে, মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়ায়; কন্যা চারি বৎসর

বয়সের হইতে না হইতে জননী হইতে চাহে; পুতুল না পাইলে একখানা ইট কোলে করিয়া ছেলের আদর করিতে শিখে। বালক পুত্র কিন্তু মা হইতে —জননী সাজিতে চাহে না; সে পিতার দেখাদেখি গাড়ী চড়িতে, ঘোড়ায় চড়িতে চাহে; স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে উৎপাত উপদ্রব করিতে থাকে। শিশু কন্যা ও পুত্রে এ পার্থক্য, এমন বৈষম্য কেন? এই মাতৃত্ব জীবের হৃদয়ে কে গাঁথিয়া দিল? বাবা মা হইবার এত সাধ কেন? উত্তরে বলিব— 'একোঽহং বহু স্যাম্' এই মহাবাক্যের ইহাই প্রাকৃত বা নৈসর্গিক অভিব্যঞ্জনা মাত্র। সুতরাং এই অভিব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ করিতে পারিলে, ইহার মর্ম বুঝিতে পারিলে, যাঁহার এই অভিলাষ, তাঁহাকে কতকটা চিনিতে পারা যাইবে।

তন্ত্র বলিতেছেন যে—চাও ত আত্মসাক্ষাৎকার। অতএব আত্মবিকাশ-পদ্ধতি এই বিশ্বসৃষ্টিতে যে ভাবে হইতেছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। কাম ও মদনের দ্বারা এই বিশ্বসংসারে আত্মার অগণ্য ও অগণিত বিকাশ হইতেছে; সুতরাং কাম ও মদনতত্ত্ব না বুঝিলে আত্মপরিচয় ঠিকমত হইবে না। আদি চ্যুতি হইতেই মদনের বিকাশ, তাই সর্বজীবে, সৃষ্টির সর্বব্যাপারে মদন যেন জড়ান মাখান রহিয়াছে। আদি চ্যুতি কি? পূর্ণ ব্রহ্ম যখন বা যে ক্ষণে 'এক আমি বহু হইব' বলিয়া বাসনা প্রকাশ করিলেন, তখনই যেন লীলার হিসাবে সেই এক বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে সোপাধিক অগণ্য আত্মা খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্যুত হইল। বিশ্বব্যাপী আত্মা অনন্ত ও অক্ষয়, চ্যুত আত্মা সকলও অনন্ত অক্ষয়; কিন্তু উপাধিবশাৎ স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র আত্মা বিশ্বব্যাপী আত্মার সহিত মিলিতে মিশিতে চাহে। যেমন সম্প্রসারণ, তেমনই সংহরণ হইবার চেষ্টা হয়। এই সংহরণ-চেষ্টাকেই বৈষ্ণব, জীবের নিত্য-বিরহ বলিয়া থাকেন। তন্ত্র এই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে মদন বলেন। তোমাকে আমার মতন করিয়া লইব, তোমাকে আমাতে পূর্ণভাবে ডুবাইয়া লইব, ইহাই হইল মদন। মদ্ভাবভাবন ইতি মদনঃ—আমার মত ভাবিত করিয়া লওয়া—আমাময় করিয়া লওয়াকেই মদন বলে। হং সঃ—অহং সঃ—আমিই যে তুমি, ইহার সার্থকতা সম্পাদন যাহার দ্বারা হয়, তাহাই মদন। চ্যুত জীব অচ্যুত পরমাত্মায় যাহার সাহায্যে মিশিতে চাহে, তাহাই মদন। যত দিন অচ্যুত পরমাত্মাকে খুঁজিয়া না পায়, তত দিন চ্যুত জীব অন্য চ্যুত জীবের সহিত মিশিবার চেষ্টা করে। ইহাই হইল সৃষ্টিবিষয়ক মদন। এই সৃষ্টিজন্য মদনের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার সাহায্যে সংসারে আত্মবিকাশ হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিজন্য মদনকে

জানিতে ও বুঝিতে পারিলে বিশ্বসৃষ্টিতে আত্মবিকাশের পরিচয় কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। ইহাই হইল মদন আরাধনার প্রথম স্তর। রসায়ন, চিকিৎসা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি পদার্থতত্ত্বজাত বিদ্যাসকল মদন আরাধনার প্রথম স্তরভুক্ত।

ইহার পরে তন্ত্র বলিতেছেন যে, তুমি মানুষ—তোমার মধ্যেই স্ত্রীত্ব ও পুংত্ব, দুই নিত্য বিদ্যমান। এই দুই শক্তির সাহায্যে তোমারই মধ্যে অনবরত সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কার্য্য চলিতেছে। এক বার দেহের ভিতরকার ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা কর না। আমি তোমাকে পথ দেখাইতেছি। ইহাই হইল দেহতত্ত্বের বা অন্তরঙ্গের সাধনা। এই সাধনার অন্তর্গত ষট্‌চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, শবসাধন প্রভৃতি সাধনার উল্লেখ আছে। দেহতত্ত্বের আরাধনায় মদনতত্ত্ব আছে, তবে সে মদনতত্ত্বের পরিণতি আত্মারামের প্রাপ্তিতে ঘটিয়া থাকে। বহিরঙ্গের এবং অন্তরঙ্গের উভয়বিধ উপাসনাতেই আত্মারাম লাভ হইয়া থাকে; কেবল উহার প্রকারভেদ ঘটে। তন্ত্র তাহারও বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন।

এইবার মোটের উপর সিদ্ধান্তটা কি দাঁড়াইল, তাহাই বুঝিয়া লওয়া যাউক; তাহার পরে কাম ও মদনের পার্থক্য বিচার করা যাইবে। তন্ত্র বলিতেছেন যে, আমি আমাকে চিনি আর নাই চিনি, 'আমি' নামক যে শক্তিসমষ্টি বা যে এক অপূর্ব শক্তি আমার দেহের মধ্যে থাকিয়া আমাকে সব দেখাইতেছে, বুঝাইতেছে, চিনাইতেছে, সেই আমিই আমার জ্ঞানের ও প্রজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন। সেই আমির মধ্যে একটা অতৃপ্তি, একটা পিপাসা অহরহঃ বিরাজ করিতেছে। সেই পিপাসা নিবৃত্তির জন্যই আমি উপাসনা করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাকি। অথবা সেই আমার পিপাসাই আমাকে, আমা অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তিকে, নিসর্গসুন্দরীর অপূর্ব বিকাশকে উপাসনা করিতে শিখায়। আমি যেন অহরহঃ আমা ছাড়া আর একটা কিছুকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি উষার রক্তিম রাগ দেখিলে বিভ্রান্ত হই, ফুলের শোভা দেখিলে মুগ্ধ হই, সমুদ্র দেখিলে—পর্বত দেখিলে আত্মহারা হই; পক্ষান্তরে মেঘগর্জনে, ঝঞ্ঝাবাতে, সমুদ্রের তুফান তরঙ্গে, ভূমিকম্পে—শক্তির বিরাট্ বিকাশে আমি যেন সঙ্কুচিত হই। তথাপি স্বভাবের এই ভীম বিকাশ দেখিলে প্রাণ যেন চায়—তাহাতে ডুবিয়া যাই—মিশাইয়া থাকি। এই পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, মোহ বা বিভ্রান্তি এক আমি বহু হইবার সাধ হইতে

উৎপন্ন। এই কামনা সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই কামনা যখন, অন্য নানা উপায়ে পরিতৃপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, তখনই জীব এক বার নিজের দিকে তাকাইয়া দেখে, এবং নিজের মধ্যে তৃপ্তির অনুসন্ধান করে। ইহাই উপাসনার মূল তত্ত্ব; এবং ইহাকেই কামোপাসনা বা মদন আরাধনা বলে। ইহা হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা কিছুই নাই। আমিই আমার ইষ্ট, আমিই আমার সাধ্য। কিন্তু এই আমি আমা হইতে বিচ্ছুরিত হইতে চাহে বলিয়াই আমার আমিত্বকে আমা হইতে ছাড়িয়া বাহিরে বিলাইয়া দেয়, বাহিরের ব্যাপারে হরির লুঠ করিয়া দিতে চাহে বলিয়াই আমি, আমা ছাড়া একটা স্বতন্ত্র দেবতার পরিকল্পনা করিতে বাধ্য হই। প্রকৃতপক্ষে সে দেবতা আমিই—আমারই আত্মশক্তি, আমারই দেহস্থ কুণ্ডলিনী। কেবলই কি তাই? আমার কুণ্ডলিনী আমার আমিত্বের শিবমূর্তির চারি ধারে যেন জড়াইয়া পাকাইয়া আছে। আমি আছি—এই জ্ঞান আমার শিবজ্ঞান; কুণ্ডলিনী এই জ্ঞানের চারি ধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাকে জীব আত্মায়, নানা অনুভূতি ও আসক্তির সমষ্টিরূপে পরিণত করিয়াছে। এই লীলাময়ী শক্তির প্রভাবে আমি একটা ব্যক্তিতে, একটা ব্যষ্টিতে পরিণত হইয়াছি। ইনিই আমাকে সোপাধিক এবং স্বতন্ত্র পুরুষে পরিণত করিয়াছেন; ইঁহারই মায়া-প্রভাবে আমি আমাকে চিনিতে পারি না, কস্তুরীমৃগের মতন আত্মশক্তির মৃগমদে বিভ্রান্ত হইয়া পাগলের ন্যায় দশ দিকে ছুটিয়া বেড়াই। এই ছুটাছুটি বন্ধ করাই উপাসনার প্রথম উদ্দেশ্য। যেমন যুবক ভালবাসা পাইলে, সুন্দরী যুবতী পাইলে শান্ত হয়, তেমনই সাধক নিজের দিকে তাকাইতে শিখিলে অনেকটা শান্ত হয়। ইহাই হইল সাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

'এক আমি বহু হইব' বলিলেই বুঝিতে হইবে, এক দুই হইয়াছে অথবা একে দ্বিতীয়ের অধ্যাস হইয়াছে। কারণ, যিনি এক ও অদ্বয়, তিনি ত দুই বা বহু হইতে চাহিবেন না। একটা অভাবের অনুভূতি না হইলে সে অভাব পূরণের চেষ্টা হয় না। কাজেই শাস্ত্র অনুমান করিতেছেন যে, সেই অক্ষয়, অব্যয় এক পদার্থে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব আছেই। এক তিনি—তাঁহাতেই জনক জননী দুই বর্তমান। স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব অথবা মাতৃত্ব পিতৃত্ব তাঁহাতে নিত্য-বর্তমান। এই দুই শক্তি যখন সম্মূঢ় অবস্থায় থাকে, তখন এক তিনি যোগ-নিদ্রায় মগ্ন, আপন ভাবে আপনি ভরপুর, আপনার অনন্ত অস্তিত্বে মহাকাশ ও চিদাকাশ, দুই পরিপূর্ণ। কিন্তু 'একোঽহং বহু স্যাম্' এই ইচ্ছাশক্তির বিকাশে অনন্ত

পরিপূর্ণতায় একটু শূন্যতা লক্ষিত হয়। কেন এমন হয়? ইহা তাঁহার লীলা, —বুঝিবার জো নাই, বুঝাইবার উপায় নাই! সৃষ্টির হিসাবে এই ইচ্ছা নিত্য; যত দিন সৃষ্টি, তত দিন এই ইচ্ছা বলবতী থাকিবেই। এই ইচ্ছা আছে বলিয়াই সংসারে রূপ আছে, শোভা আছে, আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে—কাম আছে, মদন আছে। একে দুইয়ের বিদ্যমানতা অনুমিত হয় বলিয়াই এক অন্যকে চাহে; যত ক্ষণ যোগনিদ্রা থাকে, তত ক্ষণ এই আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয় না। ঘুম ভাঙ্গিলেই অপরকে খুঁজিতে ইচ্ছা যায়। সেই ইচ্ছার অভিব্যঞ্জনা— 'সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্।' তন্ত্র বলেন,—যোগনির্দ্রাভিভূত, সম্মূঢ়, সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্মে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি যেমন বাক্য মনের অগোচর আছেন, তেমনই থাকুন। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব কেবল তাঁহাকে, যিনি বহু হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, এই বাসনাই হইল আদি কাম, এই কামজন্যই জীবসৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টি; আমরা দেহী জীব, আমরা সবাই কামজ। সুতরাং আমাদের বোধি, কামকলানিধির লীলানটনের অতীত কোন কিছু বুঝিতে পারে না। তাই কামী তিনিই আমাদের উপাস্য। তিনি কোথায়? তন্ত্র উত্তর করিলেন, —হং সঃ অর্থাৎ অহং সঃ—আমিই সেই। আমার বাহিরে তিনি আছেন কি না জানি না, তবে আমার ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই আমাকে ভিতর বাহির চিনাইতেছেন। তাই আমি বুঝিতেছি যে, আমার ভিতরে যিনি, তিনিই বাহিরের তিনি। আমি ছাড়া বাহিরে কিছু আছে কি না, তাহা ত আমি বলিতে পারি না; আমি ছাড়া বাহির কিছু থাকে কি না, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। আমার ভিতরে যিনি আছেন, যাঁহার কৃপায় আমার সর্বাবয়বে একটা আমিত্বের বিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনিই আমাকে পদে পদে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, আমিই সর্ব্বব্যাপী—আমিই তিনি।

তন্ত্র এইখান হইতে বা উপনিষদ্ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন। তন্ত্র উপনিষদের বা বেদান্তের কোন সিদ্ধান্ত অমান্য বা অগ্রাহ্য করেন না; কেবল বলেন যে, উপনিষদ্ বাহিরের আত্মাকে আগে ধরিয়া, তবে অন্তরের আত্মার পরিচয় লইতে চেষ্টা করেন। তন্ত্র সর্বাগ্রে ভিতরের আত্মার পরিচয় লইয়া, সেই আত্মার কষ্টিপাথরে বাহিরের আত্মার যাচাই করিয়া লন। সোঽহং আসল কথা নহে; অহং সঃ বা হং সঃই আসল কথা। তিনি আমি কি না—কে জানে? আমিই যে তিনি, তাহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কারণ,

আমি তিনি না হইলে আমার আমিত্বজ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? আমি দেখিতেছি, বুঝিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি—কারণ, আমিই যে তিনি। সুতরাং চিনিতে হইলে আমিই তাঁহাকে চিনিব। আমি যেমন আমা ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিনিতেছি, দেখিতেছি, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, তেমনই আমিই তাঁহাকে চিনিব, বুঝিব ও ধরিয়া আপনার করিব।

সেই আমি কে? স্ত্রীত্ব ও পুংস্বের সমবয়জাত একটা শক্তিসমষ্টি। আমার মধ্যেই মাতৃত্ব, আমারই মধ্যে পিতৃত্ব বিদ্যমান। আমি যদি নর হই, তবে আমাতে পিতৃত্ব প্রবল, মাতৃত্ব সম্মূঢ়। আমি যদি নারী হই, তবে আমার পিতৃত্ব দুর্বল বা সম্মূঢ়, আমার মাতৃত্বই প্রবল ও প্রকট। তন্ত্র বলেন,—প্রত্যেক জীবের মধ্যে স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি আছে, জনক জননী সর্বজীবে নিত্য বিদ্যমান। তবে এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি যে জীবের মধ্যে প্রবল, সেই জীব সেই শক্তি অনুসারে নর বা নারী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জীবে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ব প্রায় সমভাবেই প্রকট। স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীবে কেবল স্ত্রীত্ব ও পুংস্বের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কামজ পদার্থ বলিয়াই—'এক আমি বহু হইব' এই কামনা হইতে সঞ্জাত বলিয়াই, বিশ্বসৃষ্টির সর্বস্বে, সর্ব পদার্থে, সর্ব শক্তিতে এই স্ত্রীত্ব পুংস্ব নিত্য বিদ্যমান। ইহাই হইল তন্ত্রের চরম ও প্রধান সিদ্ধান্ত। পুরুষ যখন এক হইতে বহুধা বিভক্ত হইবার কামনা করে, তখনই তাহার অন্তর্গত স্ত্রীত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই স্ত্রীত্ব বা আদ্যা শক্তির ইঙ্গিতেই কামের বিকাশ এবং উহারই পরিতোষের জন্য মদনের উৎপত্তি। কাম ও মদন সৃষ্টিতত্ত্বের দুই জ্ঞাতব্য বিজ্ঞানযোগ্য ব্যাপার, উহা হইতে অজ্ঞেয়কে বুঝা যাইবে।

বলিয়াছি ত—এই চাঞ্চল্য, এই বহু হইবার আকাঙ্ক্ষা মদনতত্ত্বের অন্তর্গত। এই তত্ত্বের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করা যায় দুই উপায়ে—এক, মদনকে মোহিত করিয়া, মদনমোহন হইয়া; দ্বিতীয়, মদনকে ভস্ম করিয়া—মদনমথন করিয়া। এই দুই উপায় অনুসারে দুই প্রকারের উপাসনাপদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে; এক শৈব, দ্বিতীয় শাক্ত। শৈব মদনমথনের পদ্ধতি; মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র, হঠযোগ, শিবযোগ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। শাক্ত উপাসনা—মদনমথনমনোহারিণীর উপাসনা। এই উপাসনায় সাহায্যে মদনকে মুগ্ধ করিয়া, কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। তন্ত্রের এই মদনমোহন সাধনকে মূল করিয়া সহজিয়া বৈষ্ণব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধুর

রসের সাধনার উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। তবে সহজিয়া বৈষ্ণবমতের ও তন্ত্রমতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তন্ত্র আদ্যা শক্তিকে জননী বলেন, সহজিয়া সাধুগণ তাঁহাকে রমণী বলিয়া পূজা করেন। এই বিতণ্ডার কথা ধরিয়া আমি 'মানসী' এবং 'সাহিত্য' নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকায় গত পূজার সংখ্যায় একটু আলোচনা করিয়াছিলাম। তন্ত্র বলেন যে, মায়ের গর্ভে পুত্রের জন্ম হয়; কেমন করিয়া হয়, কোন্ পদ্ধতিক্রমে হয়, তাহা এক বার বুঝিবার চেষ্টা কর না—আত্মার একটু পরিচয় পাইবে। ইহাই তান্ত্রিক মদনতত্ত্বের গোড়ার একটা কথা। কাম হইল মদনের শোভা, মদনের রতি। হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ কাম হইতে হয়। বিশ্বসৃষ্টির যত শোভা, যত মাধুর্য, সবই কামজ। মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীকে তাই কাম কলানিধি কমলিনী বলা হইয়া থাকে। বৈষ্ণব সৃষ্টিতত্ত্ব বা আমার বহুধা বিভক্তির রহস্য বুঝিতে চাহেন না; সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে যে অক্ষয় মধুর রসটুকু আছে, তাহারই উপভোগ করিতে পিপাসু। তন্ত্র বলেন, তাও কি হয়– স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের তত্ত্বটুকু না বুঝিলে উহাদের সমাহারে যে জীবাত্মার সৃষ্টি, তাহাকে বুঝিব কেমন করিয়া? কেবল মধুর রসের সুধাপানে প্রমত্ত থাকিলে আত্মসাক্ষাৎকার হইবে না। সে রস যাহার বিপরিমাণ, যে লীলার পরিণতি, তাহাকে বুঝিতে হইবে। সেই বোধের অবলম্বনস্বরূপ, সেই বোধের সহায়কস্বরূপ তন্ত্র নানা সাধনাপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্র—পাপ পুণ্য, উচিত অনুচিত, শ্লীল অশ্লীল, শুচি অশুচি, কিছুই মানেন না। তন্ত্র বলেন—আছে কর্ম, কর্মী এবং সাধ্য। যে পন্থা যে সাধনার উপযোগী, তাহাই গ্রাহ্য এবং যোগ্য। এই সাধনার ব্যাপার লইয়া তন্ত্রের মধ্যে যে বিস্তর আবর্জনা সঞ্চিত হইয়াছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। অধঃপতিত, বিক্ষিপ্ত জাতির সকল ব্যাপারেই আবর্জনার সঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্র সে সঞ্চয় হইতে পরিত্রাণ পান নাই। এ জন্য তন্ত্রকে দোষী করিতে পারি না; আসল তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা করিতে পারি না। দোষ আমাদের,—দোষ আমাদের পূর্বজগণের। কারণ তাঁহাদের অনেকে মদনতত্ত্বের ফিলজফির দোহাই দিয়া ধর্মের ও সাধনার অন্তরালে কেবল রিরংসার চরিতার্থতা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—শাস্ত্রকে বিলাসের পঙ্কে ডুবাইয়াছেন।

চতুর্বর্গ সাধনে কাম একটা বর্গ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের মধ্যে কাম তৃতীয় বর্গ। যাহার দ্বারা সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টি, দুই রক্ষিত এবং পরিবর্ধিত হয়, তাহাই ধর্ম। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্—সর্বাগ্রে দেহ বলিষ্ঠ

এবং নীরোগ না হইলে ধর্মসাধন সম্ভবপর হয় না। যিনি শারীর ধর্ম রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহার দ্বারা কোন ধর্মসাধনই হয় না। রোগী সাধক হইতে পারেন না, রোগী সমাজধর্ম রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং সাধনধর্ম অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে শরীর রক্ষার ধর্ম পালন করিতে হয়। তাই সাধারণ ধর্ম প্রথম বর্গ। যে নীরোগ, ধার্মিক ও সংযমী নহে, সে অর্থ উপার্জনে সম্যক্ যোগ্যতা দেখাইতে পারে না। অর্থ কেবল টাকা নহে, যাহা সম্পত্তি, বিভব, সম্বল, তাহাই অর্থ। বিদ্যা, বুদ্ধি, তেজস্বিতা, ভূমি, জলাশয়, মণি মুক্তা, আত্মীয় স্বজন—এ সকলই অর্থ। বুদ্ধিবল, জনবল, ধনবল—এই তিন বলই অর্থের উপাদান। শাস্ত্র বলেন যে, টাকায় মানুষ রোজগার হয় না, মানুষেই টাকা রোজগার করিয়া থাকে। সুতরাং সর্বাগ্রে মানুষ গড়িতে হইবে। যে দেশে মানুষ উৎপন্ন হইবে, সেই দেশে অর্থ আপনি যাইয়া জুটিবে। তাই অর্থ দ্বিতীয় বর্গ। বর্গের তৃতীয় বিষয় কাম। কাম অর্থে কেবল রিরংসা নহে, কেবল নরনারীর সংযোগ নহে। যাহার দ্বারা সমাজের ও গৃহস্থালীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধি পায়, তাহাই কাম। চতুঃষষ্টি, কলাবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, পশুপালন, কৃষিকার্য, দেহের প্রসাধন এবং সৎপুত্র উৎপাদন—এই সকলই কামের অন্তর্গত। কামের দুইটি অঙ্গ—শোভা ও মাধুরী। যাহার সাহায্যে শোভা ও মাধুরী বৃদ্ধি পায়, জীবন শোভাময় ও সুখময় হইতে পারে, তাহাই কাম। তন্ত্রও কামের এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঐ সঙ্গে বলেন যে, যে সাধকের ধর্ম এবং অর্থসাধন হয় নাই, সে সাধক কামের অধিকারী নহে। যে কামসিদ্ধ নহে, সে মুমুক্ষু হইতে পারে না। কামের দুই প্রকারের সাধনা আছে; এক বহিরঙ্গের, দ্বিতীয় অন্তরঙ্গের। কামের বহিরঙ্গের সাধনার কথা বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; কামের অন্তরঙ্গের সাধনা তন্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে যেমন কেবল রিরংসার বিষয়ের উল্লেখ নাই, উহা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে, তেমনি তন্ত্রের কামসাধনায় কেবল লতাসাধনার কথাই নাই, উহা ছাড়া অনেক গূঢ় তত্ত্বকথার উল্লেখ আছে। কামতৃপ্তি না হইলে মোক্ষের সাধ প্রবল হয় না, সে মোক্ষের অধিকারী নহে। এই চতুর্বর্গের ব্যাখ্যা করিয়া তন্ত্র বলিতেছেন যে, যাহারা এই চতুর্বর্গের সাধনা করে, তাহাদিগকে চতুর্বর্গী বলা হয়। সপ্তসরিদ্বরা কর্মভূমিতে যাহারা বাস করে, তাহারাই চতুর্বর্গী হইবার অধিকারী; পৃথিবীর অন্য সকল প্রদেশের নরনারী—কল কেহ

বা ত্রিবর্গী, কেহ বা দ্বিবর্গী। চতুর্বর্গসাধনপরায়ণ মনুষ্যই সর্বাপেক্ষা সভ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ইউরোপের আধুনিক শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান জাতিসকল ত্রিবর্গী। চতুর্বর্গী না হইলে জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা সমেত থাকিয়া চিরজীবী হইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। পুত্রোৎপাদনে কৃতসঙ্কল্প নরনারীর সঙ্গমকে শাস্ত্র ত নিন্দা করেন না, তন্ত্রও মন্দ বলেন না। যাহার সাহায্যে নূতন জীবের উৎপত্তি হয়, নূতন আত্মার উন্মেষ ঘটে, তাহা শাস্ত্রের বা তন্ত্রের দৃষ্টিতে হেয় বা জঘন্য নহে। শাস্ত্র তাই পুত্রোৎপাদনের একটা সায়ান্স বা বিজ্ঞান লিখিয়া গিয়াছেন। গর্ভাধান হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র কেবল গর্ভসংস্কারে, ভ্রূণের পুষ্টির জন্যই ব্যস্ত। বাৎস্যায়নের কামসূত্র এই জীবসৃষ্টির সায়ান্স মাত্র। কাম এই জীবসৃষ্টির প্রেরণা, মদন উহার শক্তি মাত্র। যেমন শরীর রক্ষা করিতে হইলে একটা পদ্ধতির অধীন থাকিতে হয়, অনেকগুলি বিধি নিষেধ পালন করিতে হয়, তেমনি পুত্রোৎপাদন করিতে হইলে একটা পদ্ধতির অধীন থাকিতে হয়; গোটাকয়েক বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারই নিন্দনীয়। সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্—কোন বিষয়ের আত্যন্তিকী বৃদ্ধিই গর্হিত বা অহিতকর। যেমন অতিভোজন দোষের, তেমনি লাম্পট্য দোষের। কোন ব্যবহারের অতিবৃদ্ধিকেই লাম্পট্য বলে। সে কালে ভোজনলম্পট, শয্যা ও ভূষণলম্পট প্রভৃতি অনেক লম্পটই ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কীর্তনলম্পট বলা হইয়াছে। অধুনা কামবিলাসীকেই সোজাসুজি লম্পট বলা হইয়া থাকে। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে তাই লম্পট বলিলে গালাগালি করা হয় না, কেবল ব্যাজস্তুতি হয় মাত্র। শাস্ত্রের হিসাবে সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে এই লাম্পট্যই দোষের। যাহারা তেজস্বী, সিদ্ধ সাধক, তাহাদের পক্ষে কোন কিছুরই লাম্পট্য দোষের বা নিন্দার নহে। সুতরাং শাস্ত্র যে ভাবে কাম ও মদনের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ষোল আনা সায়ান্সের হিসাবেই করিয়াছেন বলিতে হইবে। স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির সম্মেলন, বিশেষতঃ নরনারীর সম্মেলনকে হীনযানী বৌদ্ধগণই সর্বাগ্রে নিন্দার বিষয়ীভূত করেন। বোধ হয় বৌদ্ধদের নিকট হইতেই খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বিগণ এই নিন্দা গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া কাম ও মদনের প্রতি এই বাহ্যিক নিন্দার ও সঙ্কোচের ভাব অবলম্বন করিয়াছি; কেন না, আমাদের বসন ভূষণের ভঙ্গী, নয়নের দিঠি, দেহের হাবভাব দেখিলে দৃঢ়

বিশ্বাস হয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে এক এক জন কাম-কলানিধি। কামচর্চা অবাধে চলিলে সমাজ বিগড়াইতে পারে, ক্ষীণজীবী, অল্পায়ু পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারে বলিয়াই শাস্ত্র এই ব্যাপারের উপর সংযমের ঘন আবরণ দিয়া রাখিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্র এই বিষয়ের আলোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তেমন সঙ্কোচ অনুচিত বলিয়া মনে করেন। তন্ত্রও কামসাধনা অতি গোপনে করিতে বলেন, গুরুকে সম্মুখে না রাখিয়া কামসাধনা করিতে নাই। সে কামসাধনা তৃপ্তি তুষ্টির জন্য নহে, আত্মশক্তির অন্বেষণ উদ্দেশ্যেই করিতে হয়।

ইহাই হইল মদন ও কামতত্ত্বের গোড়ার মোটা কথা—সাধারণ সিদ্ধান্ত—general truths. ইহার আরও গোটাকয়েক সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে বুঝিবার ও জানিবার অধিকার সকলের আছে। সে সব সিদ্ধান্তের আলোচনা পরে করিব।

২

কাম ও মদনতত্ত্বের দার্শনিকতা বা ফিলজফিটুকু গত বারে যথাসম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার কোন্ থিওরি বা সিদ্ধান্তের উপর সাধনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। তন্ত্র বলেন যে, তোমার নিজের আত্মাই তোমার ইষ্টদেবতা ; তাঁহারই সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা।

'আত্মানাং চিন্তয়েদ্দেবীং শক্তিমাত্মাস্বরূপিণীম্।'
'অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহং ইতি ভাবয়েৎ।'
'সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥'

কেবল ইহাই নহে ; স্বীয় আত্মাকে ত ইষ্টদেবতা—বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ ভাবিতেই হইবে ; যিনি এমন চিন্তা না করিয়া, অন্য একটা স্বতন্ত্র শক্তিকে বা পদার্থকে ইষ্ট বা ঈশ্বর বলিয়া ভাবিবেন এবং তাহারই পূজা উপাসনা করিবেন, তিনিই নিরয়গামী হইবেন।

"মন্যন্তে যে তু চাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহারা বাহিরের দেবতাকে দেখিতে পান না, স্বীয় আত্মারও পরিচয় পান না, তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা হয়। অথবা যাঁহারা আত্মস্থ দেবতাকে ছাড়িয়া বাহিরের দেবতার চিন্তা করেন, তাঁহারা করস্থ কৌস্তভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ান। এই দুইটি শ্লোক যেমন তন্ত্রে পাওয়া যায়, তেমনি কূর্মপুরাণেও পাওয়া যায়। তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে পুরাণ অমান্য করেন না।

এই দেহের মধ্যে আত্মা আছেন। সে আত্মা দেহের কোথায় বিরাজ করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্র দুইটা উত্তর দিতেছেন ; প্রথম বলিতেছেন যে, আত্মা সর্বদেহের সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত, তাঁহার শক্তির দ্বারা দেহের সকল অংশ, সকল কণা সঞ্জীবিত কিন্তু সে আত্মাকে ত ধরিতে পারা যায় না। অতএব ষট্‌চক্রের মধ্যে যেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রিয়া করিতেছেন, সেইখানেই তাঁহাকে পাইবে—অথবা শিবশক্তিসমন্বিত যিনি, তিনিই দেহগত ইষ্টদেবী।

"শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাদিন্দুং পরমকুণ্ডলীম্।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎসমপ্রভা ॥"

অর্থাৎ শিব শূন্যরূপ—অহমস্মি এই জ্ঞানদ্যোতক। এই শূন্যরূপ শিবকে বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনী বিরাজ করিতেছেন। শিবকে শব্দব্রহ্মময়বপুও বলা হইয়াছে ; আবার শব্দরূপ মহাদেব বলিয়াও সেই মহাদেবের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। দেহের ছয়টা চক্রের প্রত্যেক চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। আর কুণ্ডলী দেবী চক্রে চক্রে এই মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এ কুণ্ডলিনী সহস্রারে "কামসমুল্লাসবিহারিণী" অথচ তিনি বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপা, চিন্ময়ী ও অরূপিণী। এই বিষতন্তুময়ী এবং সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপিণী কুণ্ডলী দেবীকে দ্বাদশ বার ষট্‌চক্র ভেদ করাইলে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। সে ষট্‌চক্রভেদ কেমন ? প্রত্যেক চক্রে কুণ্ডলী দেবীকে লইয়া যাইয়া, শব্দরূপ নিরাকার শিবের সহিত রমণ করাইতে হইবে, তবে সাধনা সিদ্ধ হইবে।

"সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে।
অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি ॥"

এই অমৃত—এই সুরা, জীবাত্মা চক্রে চক্রে পান করিয়া এক বার উর্ধ্বে সহস্রারে উঠিবেন, আবার মূলাধারে আসিয়া পড়িবেন; আবার উঠিবেন, আবার পড়িবেন। এই প্রকারে দ্বাদশ বার ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া উঠিলে এবং পড়িলে আর জন্ম-জরার ভয় থাকে না। এই তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তন্ত্রের 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণীতলে' বচন রচনা করা হইয়াছে। উহাকে মাতালের উঠা পড়া ধরিয়া মোটা অর্থ করিলে সর্বত্র উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। কাজেই বাধ্য হইয়া উহার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিতেই হইবে। উহা তান্ত্রিক ষট্‌চক্রভেদের একটা ইঙ্গিত মাত্র। এইবার কুণ্ডলিনীর একটু পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। মহানির্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন :

"সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥
মহত্তত্ত্বাদি ভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্॥
সদ্রূপং সর্বতো ব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ববস্তুষু॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্‌মনসগোচরম্॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥"

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে একমাত্র তুমিই অমর অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে। তোমার সেই রূপ বাক্য ও মনের অগোচর; পরমব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার দ্বারাই তোমা হইতে সর্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পৃথিবী পর্যন্ত সর্বজগৎ তোমা হইতে সৃষ্ট। সর্বকারণের কারণ সেই ব্রহ্ম নিমিত্তমাত্র। তিনি সৎস্বরূপ ও সর্বব্যাপী, সমুদয় জগৎকে বেষ্টন করিয়া আছেন; সর্ববস্তুতে সর্বদা একরূপ, পরিণামরহিত, চিন্মাত্র এবং নির্লিপ্ত। তিনি কোন কার্য করেন না, তিনি ভক্ষণ করেন না, গমন করেন না; কোন বস্তুবিশেষে তাঁহার অবস্থিতি নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি আদি-অন্তরাহত, তিনি বাক্য মনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী। তুমি তাঁহার ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, এই জগৎকে পালন করিতেছ এবং সর্বশেষে সর্বজগৎকে সংহার করিতেছ। তন্ত্র

বলেন—এই ইচ্ছাই কাম, সেই কামকে অবলম্বন করিয়া যিনি কামনার জগৎ-প্রহেলিকা বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই মহাকাল-কামিনী কালী। এই কালীই মহাকাল শিবের সহিত সদাই রমণ করেন। সে কালী কেমন?

"কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে॥"

সর্বপ্রাণী—সর্বসৃষ্টিকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল—সেই শিবলিঙ্গ মহাকাল। সেই মহাকালকে—শিবলিঙ্গকে তুমি গ্রাস কর, আত্মদেহস্থ করিতে পার বলিয়াই তোমার নাম পরা কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর—তাই তুমি কালী।

এই সিদ্ধান্তের পর তন্ত্র বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
শোণিতেষু স্বরাঃ প্রোক্তাঃ ভাবা সাগর কীর্ত্তিতাঃ॥"

ইহা দ্বারা দেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমতা সাধন করা হইয়াছে। বাহিরে যে লীলা হইতেছে, দেহাভ্যন্তরেও সেই লীলা চলিতেছে। বাহিরের শিব-কালীর লীলা পতি জীবের দেহাভ্যন্তরে চলিতেছে। সুতরাং ভিতরের শিব-শক্তির ক্রিয়াটা বুঝিতে পারিলে বাহিরের লীলাও অল্পায়াসে বুঝা যাইবে। এইখানে কর্মবাদী তন্ত্র-পুস্তকসকলে একটা থিওরি বা মতবাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, যুবক-যুবতীর সংসর্গে আর একটা জীবের উৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে। অতএব যুবক-যুবতীর মিলন ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের খেলা বুঝিতে পারিবে। এই খেলার ক্রম, উন্মেষ ও ভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপার হইতেই আত্মবিকাশের পদ্ধতিটা কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আত্মা কি ও কেমন, তাহা জানি না, বুঝি না। কিন্তু পুত্রোৎপাদন ক্রিয়ায় আত্মার বিকাশচেষ্টা এবং বিচ্ছুরণভঙ্গী দেখিতে পাই। সেই ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে—কোন্ কোন্ শক্তির প্রয়োগে, দেহস্থ কোন্ শক্তির কি ভাবের ক্রিয়ার রজোবীর্যের সাহায্যে নূতন জীবের উৎপত্তি হইতে পারে। যে ক্রিয়ার দ্বারা নূতন জীব উৎপন্ন হয়, সে ক্রিয়ার পরীক্ষায় আত্মশক্তির খোঁজ খবর পাওয়া যাইতে পারে। দেহস্থ আত্মশক্তির ঠিকানা করিতে পারিলে বিশ্বব্যাপী আত্মশক্তির খবরটাও পাওয়া

যাইতে পারে। এই থিওরি হইতেই এক শ্রেণীর তন্ত্রে কামজ আরাধনার পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে সাধনা অতি কঠোর, অতি দুরারাধ্য। শিব বলিয়াছেন যে, 'হে দেবি, তোমার মত নারী এবং আমার মতন পুরুষ হইলেই এই খেলা খেলিতে পারে। বরং ফণী ধারিয়া বিষ ভক্ষণ করা সহজ, বরং সিংহ শার্দুলের সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কিন্তু লতাসাধনা অতি কঠিন, অতি কঠোর। যে পুরুষের নারীরূপ দেখিয়া কামমোহ উৎপন্ন হইতে পারে, যে রতিজন্য সুখাস্বাদে বিভোর হয়, সে যেন এমন কাজ না করে।' এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া শিব আবার বলিতেছেন,—সমস্ত জগৎকে স্ত্রীময় ভাবিতে হইবে। শক্তিই শিব, শিবই শক্তি—এই সমস্ত জগৎই শক্তির স্বরূপ। যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারেন, তিনি যেন এ সাধনায় প্রবৃত্ত না হন। শ্রীক্রমে, কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে শিব বার বার বলিয়াছেন যে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কদাপি মদ্য ব্যবহার করিবে না। মদ্যের অনুকল্প হিসাবে ব্রাহ্মণ গোদুগ্ধ, ক্ষত্রিয় মধু, বৈশ্য ইক্ষুর রস বহিরঙ্গের পূজায় দান করিবে। কেবল শবরাদি শূদ্র ও অন্ত্যজজাতীয় সাধকগণ সুরা বা মদ্য ব্যবহার করিবে। আসল কথা, দেহস্থ যে শক্তির উন্মেষ সাধন জন্য সুরা পান করা হয়, তাহা যদি অন্য কোন উপায়ে ঘটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সুরা পান না করাই ভাল। ব্রাহ্মণ সাধকও যদি সুরার সাহায্য ব্যতীত দেহের শক্তিবিশেষের জাগরণ ঘটাইতে না পারেন, তাহা হইলে গুরু আদেশ করিলে, অবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণেও সুরা পান করিবে। কিন্তু দেহতত্ত্বের সাধনায় ষট্‌চক্রভেদের ব্যাপারে তন্ত্রে দেহস্থ শোণিতকেই সুরা বলা হয়। তন্ত্রে স্পষ্টই বার বার বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, কামবশতঃ, স্ত্রীবিশেষের রূপে মুগ্ধ হইয়া এই সাধনা করিবে, তাহার মহারৌরবে পতন হইবে। তন্ত্র বহু স্থানে বলিয়াছেন যে, মানস পূজাই সকল পূজার সার, ষট্‌চক্রভেদ সকল সাধনার সার। মানস পূজাপদ্ধতিরই ক্রম বাহুল্যভাবে নানা তন্ত্রে লিখিত; বাহ্য পূজার উপচার ও পদ্ধতির কথা যে নাই, তাহা নহে। তন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, গৃহস্থ কৃতদার হইলেও তন্ত্রসাধনা করিবে, পরন্তু তেমন গৃহস্থ বিষয়ী না হয়, অর্থ উপার্জনের জন্য চেষ্টা না করে, সমাজের দশ জনের সহিত বৈষয়িক সম্বন্ধ না রাখে। তাহাদের স্ত্রীপুরুষ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর মতনই থাকিবে। পক্ষান্তরে জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে শিবশক্তির যোগই প্রধান যোগ। সে শিবশক্তির যোগ ষট্‌চক্রভেদের পদ্ধতি হিসাবে সাধকের

দেহের মধ্যে হইতে পারে। যে নিম্নাধিকারী তেমন সাধন করিতে না পারে, সে বাহিরের শক্তি আনিয়া সেই শক্তির সহিত যোগ সাধন করিলেও যোগ হয়। এই যোগসাধন কুলনায়িকার সাহায্যে করিতে হয়। কুলনায়িকা যথা—নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, পুরুশী, নাপিতাঙ্গনা, রজকী, রঞ্জকী, সৈরিন্ধ্রী, সুবাসিনী, ঘটিকা, খটিকা ও গোপালকন্যা। ললিতাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, কুলাগারে প্রবাহিণী তিনটি নাড়ী আছে এই তিন নাড়ীর পূজা করিতে হয়; কারণ, এই তিন নাড়ী বহিয়া আত্মশক্তি বিস্ফারিত হইয়া অণ্ডাকারে পুরুষের বীজসম্ভব শক্তিকেন্দ্রকে ধারণ করে। এই ধারণা হইতেই জীবোৎপত্তি হয়। এই তিন নাড়ীর কামনা কামকলার সাহায্যে করিতে হয়। ষোলটি কামকক্ষ আছে; যথা,—শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ভূতি, কান্তি, মনোভবা, মনোহরা, মনোরমা, মদনোন্মাদিনী, মোহিনী, দীপনী, শোষণী, বশঙ্করী, রজনী, ষোড়শী, ও প্রিয়দর্শনা। এই কামকলার এক একটি কলার চর্চা সাহায্যে আত্মার এক একটি শক্তির উন্মেষ ঘটিয়া থাকে, সাধক ঋষি সিদ্ধি লাভ করে।

তন্ত্রের দুইটি দিক্ আছে। এক, অতি কঠোর সংযমের দিক্; আর একটা experiment-এর দিক্। সে পরীক্ষার চারিদিকে এত সংযমের বেষ্টন যে, সামান্য মনুষ্য তেমন উপভোগ লাভ করিবার সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিতেই পারে না। এই পঞ্চতত্ত্বসাধনা, লতাসাধনায় এত বাঁধাবাঁধি, এত বিধিনিষেধ, এত মন্ত্রজপ, এত সংযম সাধনা আছে যে, সে সব করিয়া পরে স্ত্রীগমনের ইচ্ছা পর্যন্ত যেন শুকাইয়া যায়। অত হাঙ্গামা সহ্য করিয়া এমন সাধনা করিতে আজকালকার তরলবীর্য পুরুষে পারে নাই। তাই তন্ত্রের বহিরঙ্গের সাধনায় যত কদাচার ও অনাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এত আর কিছুতেই করে নাই। জাতির অধঃপতন এবং সর্বনাশ মঞ্জুঘোষের (বৌদ্ধ বজ্রযানী) সাধনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হইয়াছিল। এই মঞ্জুঘোষের সাধন পদ্ধতির কথা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার তন্ত্রসারে উহার উল্লেখ আছে। আমাদের তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্র যে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। তবে পুরাতন হিন্দু তন্ত্রের লেখা এখনও স্পষ্ট দেখা যায়।

অধুনা ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে নর নারীর যৌন সম্বন্ধটা যেমন গোপনের ও লজ্জার বিষয় হইয়াছে এতটা লজ্জা, এতটা গোপন ভাব পূর্বে এ দেশ ছিল না। পূর্বে এ সকল বিষয়ের প্রকাশ্যে আলোচনা চলিত, কবি

ইহারই উপর স্বীয় কাব্যশক্তির বিকাশ ঘটাইতেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। কাব্যাংশে উহার স্থান এখন যেখানেই নির্দিষ্ট হউক না কেন, উহা যে দ্ব্যর্থবাচক, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। উহার আগাগোড়া কালী পক্ষে ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে তন্ত্রের উপাসনাপদ্ধতি স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে; পক্ষান্তরে বিদ্যাপক্ষে সাদাসিধে ব্যাখ্যা করাও চলে। এইটুকু বলিবার জন্যই প্রত্যেক পালার শেষে রামপ্রসাদ ভনিতা করিয়াছেন,—

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই॥

শুনিয়াছি, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেরও এমনই ভাবে কালীপক্ষে অর্থ করা যায়। কেবল পার্থক্য এই যে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর হইতে যে পদ্ধতির উপাসনার কথা ফুটিয়া উঠে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে সে পদ্ধতির উপাসনাতত্ত্ব জানা যায় না। ভারতচন্দ্র দক্ষিণাবর্তের দক্ষিণা কালীর পূজার কথা কহিয়াছেন, রামপ্রসাদ রামমার্গের সাধনার বিবরণ দিয়াছেন। আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহ দলের লোকেদের মধ্যে এ তত্ত্বটা বেশ জানা ছিল। কথাটা তুলিবার হেতু এই, ন্যূনাধিক শত বর্ষ পূর্বে আমাদের সমাজে প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল, যে সকল সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া লোকে গ্রহণ করিত, এখন আর তাহা নাই। সে সাধনা, সে ধারণা এখন একরকম লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সমাজে সাধারণ ভাবে সাধনা প্রচলিত না থাকিলে কবি দুই জন এমন দুই দিক বজায় রাখিয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিতেন না। উভয়েরই বিদ্যাসুন্দর উভয়েরই রচিত চণ্ডীর গানের অংশবিশেষ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অংশ ভারতের বিদ্যাসুন্দর; রামপ্রসাদের কালীকীর্তনের অংশ কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর। সুতরাং উহা যে কেবল ইয়ারকির বহি নহে, এমন অনুমান করা যায়। পূর্বে যাহারা কালী-কীর্তন করিত, তাহারা বিদ্যাসুন্দরের গানও করিত, উমুশে ভুলোর যাত্রার হিসাবে নহে, খাঁটি সাধনতত্ত্বের হিসাবে গান করিত। সেই গানের ভঙ্গী দেখিয়া, তাহাতে খাঁটি বাবুয়ানির রসিকতা মিশাইয়া গোপাল উড়ের যাত্রা তৈয়ার করা হইয়াছিল। কাজেই বলিতে হয়, শত বর্ষ পূর্বে তন্ত্র-সাধনা যেন সমাজের স্তরে স্তরে গাঁথা ছিল। সেকালের কর্তাদের প্রায় সকলেরই এক একটি শক্তি—নায়িকা ছিল; যাহার অর্থ-সামর্থ্যে কুলাইত, অথবা সিদ্ধ সাধক

ব'লিয়া যাহারই সমাজে খ্যাতি হইত, তাহারই নায়িকা থাকিত। চণ্ডীদাসের 'রামী রজকিনী' গোপন কথা নহে, বরং শ্লাঘার বিষয় ছিল। রাজা রামমোহন রায় যে শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন, সে কথা প্রকাশ করিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন নাই। এই এক শত বৎসরের মধ্যে আমাদের সমাজের একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এতটাই শিক্ষা দীক্ষার ওলট পালট হইয়াছে যে, শত বৎসর পূর্বেকার সমাজকে আমরা এখন ঠিকমত চিনিতে বুঝিতে পারি না। এই তন্ত্রসাধনার ফলে যে কেমন সিদ্ধিলাভ হইত, তাহা এখন আমরা অনুমানেও আনিতে পারি না। বামা ক্ষেপাকে এক বার জিজ্ঞাসা করি,—"এই শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া, মড়া ঘাটিয়া, সুরাপান ও শক্তিসাধন করিয়া কি সুখ? তোমার ঘর বাড়ী আছে, ভাই ভগিনী আছে, ভূমিসম্পত্তি আছে, তাহা ছাড়িয়া এই অঘোর-পন্থা, এই বামাচার কেন অবলম্বন করিলে?" হাসিয়া পাগলা বলিয়াছিলেন,—'ইহার মধ্যে একটা এমন কিছু আছে, যাহার জন্য ছার সংসারের ঐশ্বর্য্য, সুখবিলাস, স্বর্গের সুখও তুচ্ছ করা যায়। বুঝাইবার নহে ত বাবা, ভাগ্যে না থাকিলে ইহার মহিমা বুঝা যায় না।' বাস্তবিক একটা কিছু দুর্বার আকর্ষণ না থাকিলে লোকে ইহাতে মজিবে কেন? বামাচরণ এবং বক্রেশ্বরের ন্যাংটা বাবা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কালের দুই জন প্রকট তান্ত্রিক ছিলেন। ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাও ছিল, তাহার একটু আধটু পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বলিব কি বিস্ময়ের কথা, কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। ইদানীং তন্ত্রপদ্ধতির বাহিরের সাধক দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তন্ত্র হঠযোগের কথা অনেক স্থানে বলিয়াছে, রাজযোগের পদ্ধতি ও ক্রমের উল্লেখ করিয়াছে, ইহা ছাড়া আর একটা যোগশাস্ত্রের কথারও উল্লেখ আছে। সারদাতিলকে আছে, 'শিবশক্তি উভয়াত্মক এই শরীর ষট্‌নবতি আঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ; ইহার মধ্যে গুহ্যদেশে ও ধ্বজের মধ্যস্থলে দুই অঙ্গুলি উন্নত একটি পথ আছে। তাহার বিস্তার ইহার দ্বিগুণ; এই পথ বৃত্তাকার। এই মূলাধার হইতে যে সমস্ত নাড়ী উদ্‌গতা হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধানা। বাম দিকের নাড়ী ইড়া, দক্ষিণের পিঙ্গলা, মধ্যে মেরুদণ্ডাশ্রিতা সুষুম্না। এই সুষুম্নার মধ্যে চিত্রার পথেই শিব-সামরস্য ঘটিয়া থাকে। সৌভাগ্যশালী সাধক সেই দেহগত শিব ও শক্তির সামরস্যে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।' নিম্নাধিকারীর পক্ষে শিব ও শক্তি—নর ও নারী স্বতন্ত্রভাবে যুক্ত করিয়া

শিবলামরস্ত লাভ করিতে হয়। সেই নিম্নাধিকারীর পক্ষেই পঞ্চ তত্ত্বের বা পঞ্চ ম-কারের সাধনা প্রশস্ত বলিয়া নিগম আগমে উক্ত হইয়াছে। দেহের এক একটি ক্রিয়া এক প্রকটি শক্তিপ্রভাবেই হইয়া থাকে। চর্চা করিলে সে সকল শক্তিকে প্রবলা করা চলে। যে শক্তির প্রভাবে ভুক্ত অন্ন হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি হয়, এবং মূত্র পুরীষ পৃথক্ হইয়া যায় এবং এই দুগ্ধ বা পীযুষ হইতে শুক্র ও বেদ মজ্জা নির্মিত হয়. তাহাই হংসঃশক্তি। দেহের মধ্যে এবম্প্রকারের চতুঃষষ্টি শক্তি আছে; ইহারাই চৌষট্টি যোগিনী। বাহিরে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই চৌষট্টি যোগিনীর ক্রিয়া হইতেছে, ভিতরে দেহভাণ্ডেও ঐ চৌষট্টি যোগিনীর ক্রিয়া সমভাবে হইতেছে। বাহিরের ও ভিতরের শক্তির সমঞ্জসী-করণকেই—সমরসতাপ্রাপ্তিকেই আগমনি-গমানুসারে যোগ বলা হয়। তেমন পুরুষার্থ থাকে—নিজের দেহের সাহায্যে নিরালম্ব ভাবে যোগসাধনা কর, নহিলে বাহিরের শক্তির সাহায্য লইয়া স্বদেহস্থ সম্মূঢ় শক্তির উদ্বোধন সাধন করিতে হইবে। তন্ত্র, ভিতরের ও বাহিরের দুই পন্থাই স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ইহাই নিগমাগমের, যোগসাধনার, আত্মদর্শনের থিওরি।

গুরুমুখ না করিয়া তন্ত্র বুঝা যায় না! উহা সাধনার ধন, Experimental Science, করিয়া কর্মিয়া সম্মুখে দেখাইয়া দিতে হইবে। গুরু দেখাইয়া দেন, শিষ্য সেই experiment দেখিয়া নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। গুরুর সাহায্য ব্যতীত তন্ত্রসাধনা বুঝান যায় না। তাই তন্ত্রে গুরুর এতই আদর। কেবল তন্ত্র কেন, যোগ-শাস্ত্রেও—মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র এবং পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র—সকল সাধন-শাস্ত্রেই গুরুর আসন অতি উচ্চে। গুরু ঈশ্বরের সমান পদবীর পুরুষ; কারণ, গুরুর সাহায্য ব্যতীত আত্মদর্শন সম্ভবপর নহে। তবে সোজাসুজি আমাদের ইংরেজী বুদ্ধি লইয়া তন্ত্র পড়িলে বুঝা যায় যে, Anatomy, Physiology এবং Biology, এই তিন তত্ত্বের সাহায্যে উহা আত্মদর্শনের সাধনপদ্ধতি মাত্র। তন্ত্রের মধ্যে যে Black Art নাই, এমন কথা বলি না। যে যে সাধনে দেহের ভাল মন্দ এবং বাহ্য জগতের ভাল মন্দ সকল প্রকারের শক্তিসঞ্চয়, শক্তির উন্মেষ ঘটে, তন্ত্র সেই সকল সাধনের উন্মেষ করিয়াছেন। তন্ত্রসার, সারদাতিলক প্রভৃতি সঙ্কলনগ্রন্থে সেই সময়কার পৃথিবীর বহু সাধনধর্মের উল্লেখ আছে। পুরাতন সিদ্ধাচার্য্য-দিগের সহজিয়া বৌদ্ধ তন্ত্রধর্ম, নাথীদিগের ধর্ম, অঘোরঘণ্টের ধর্ম, এমন কি, মুসলমানদের সুফী ও শক্তিসাধনার উল্লেখও আছে। ইউরোপের মধ্যযুগে

Satan Worship বা শয়তানের পূজার এক গুপ্ত সাধনা প্রচলিত ছিল। সে সাধনা অনেকটা তন্ত্রসাধনার অনুরূপ, অনেকটা বৌদ্ধ মহাযানীদিগের মারসাধনার অনুরূপ ; তাহার বিবরণও কোন কোন সঙ্কলনগ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্ত্র বলিলে একটা বিরাট্ বিশাল বিশ্বব্যাপী সাধনধর্মের, শক্তিসাধনপদ্ধতির সমবায় বুঝিতে হইবে। তন্ত্রের এক দিকে মদ্য মাংস মৈথুনাদির যেমন কঠোর নিষেধ আছে, অন্য দিকে মদ্য মাংস মৈথুনাদির ছড়াছড়ি আছে। গো শূকরের মাংস মহামাংস বলিয়া তন্ত্রে পরিচিত হইয়াছে, আবার উহাদের ব্যবহার স্থানান্তরে নিষিদ্ধও আছে। কাজেই তন্ত্রের বিচার করিতে হইলে কেবল সঙ্কলন-গ্রন্থ, মহানির্বাণ তন্ত্রাদির ন্যায় সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিলে চলিবে না। উহার মূল গ্রন্থসকলকে লইয়া ভাগ করিতে হইবে ; ক্রান্তি, আম্নায় প্রভৃতি ধরিয়া ভাগ করিতে হইবে ; বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য, নাথী, কালচক্রযানী, মঞ্জুঘোষী, জালালী, আউলিয়া, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায় ধরিয়া উহাদের ভাগ করিতে হইবে ; ভাগ শেষ হইলে তখন বুঝা যাইবে— কোন্ তন্ত্র কোন্ স্তরের, কোন্ যুগের, এবং কোন্ জাতির। রাজার সাহায্য না পাইলে এবং বহু তান্ত্রিক পণ্ডিতের সমাবেশ না হইলে এ কাজ পূর্ণ হইবার নহে। যখন তাহার প্রয়োজন বোধ হইবে, তখন তাহা সম্পন্ন হইবেই।

তন্ত্রের adaptibility বা উপযোগিতার একটা পরিচয় এইখানে দিব। আকবর শাহ দীন-ই-ইলাহি নামক এক মুসলমানী নব বিধানের সৃষ্টি করেন। এই দীন-ই-ইলাহির সাধনপদ্ধতি তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির অনুরূপ ; যাহারা এই সাধনা করিত এবং ফকিরী গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে জালালী ফকির বলিত। বৃহৎতন্ত্রসারের দুই একখানা পুঁথিতে জালালী সাধন-পদ্ধতির নির্দেশ আমি দেখিয়াছি। আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা তন্ত্রপুস্তক ছাপাইয়া অর্থোপার্জন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে নিজ নিজ পুঁথি 'শুদ্ধ' করিয়া— মুসলমানী ও বৌদ্ধগন্ধবর্জিত করিয়া ছাপিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই হাতের লেখা পুঁথি না পাইলে তন্ত্রের অনেক তত্ত্ব ঠিকমত বুঝা যায় না। অনেকে বলেন, ইংরেজী সভ্যতার গুণে orthodoxy অনেক কমিয়াছে ; আমার কিন্তু বিশ্বাস, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে orthodoxy বা হীন গোঁড়ামি বেজায় বাড়িয়াছে। পুরাতন পরিচয় মুছিয়া ফেলিবার জন্য যেন সবাই ব্যস্ত ; খ্রীষ্টানী moral আদর্শের এবং বৈদিক বর্ণাশ্রমী হিন্দু যেন সবাই ছিল, এই পরিচয় সকলকেই দিতে ব্যস্ত। তন্ত্রধর্মের ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে

মোগল পাঠানের শাসনকালে সমাজে যে কি একাকারই ঘটিয়াছিল, তাহার পরিচয় এখন অনেকেই ঢাকিতে চেষ্টা করেন। ফলে আসল সত্য কথা ক্রমশঃ ঢাকাই পড়িতেছে। তন্ত্রের ঐতিহাসিকতার বিষয় যদি আলোচনার যোগ্য হয়, তবে সে বিচার পরে হইবে।

তন্ত্রের কাম ও মদনের philosophy বা দার্শনিকতা এবং theory বা তত্ত্বকথা সজ্জনসমাজে যতটুকু ইসারা ইঙ্গিতে বলা যায়, ততটুকু আমি বলিয়াছি। ভিতরকার কথা শুনিতে হইলে গুরুমুখ করিয়া শুনাই কর্তব্য। তন্ত্র শক্তিসঞ্চয়ের সাধনার কথাই বলিয়াছেন; সেখান হইতে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তন্ত্র তাহারই আহরণ করিয়াছেন। কাম ও মদন সৃষ্টির আদি শক্তি, কাম ও মদন জীবসৃষ্টির আদি তত্ত্ব, তাই কাম ও মদনের সাহায্যে জীবসৃষ্টির গুপ্ত তত্ত্ব জানিবার জন্য তন্ত্র ব্যস্ত। তন্ত্র বলেন, নরনারীর কাম ও মদন হইতে সদ্যোজাত নূতন শিশুর অহঙ্কার বা আত্মানুভূতি ঘটিয়া থাকে। কাম ও মদন সাহায্যে এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চার হয়। অতএব এই কাম ও মদনের বিশ্লেষণই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়। দুই হইতে তিন কেমন করিয়া জন্মায়, ইহা না বুঝিলে এককেও বুঝিবে না, দ্বিতীয়কেও চিনিবে না, তৃতীয়ের মূল্যও যাচাই করিতে পারিবে না। নর নারীর যোগ হইলেই কিছু গর্ভসঞ্চার হয় না;—কেন হয় না? ইহার উত্তর যদি ঠিকমত দিতে পারে, তাহা হইলেই বুঝিবে, আত্মশক্তির ক্রিয়া কেমন ভাবে দেহের মধ্যে হইতেছে। অমোঘাঃ পশবো বীর্য্যাঃ—ইহাই বা হয় কেন? মানুষের পক্ষে এমন ব্যাঘাত ঘটে কেন? ইহার ভিতরকার তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, দেহতত্ত্বের অনেক কথা জানিতে পারিবে। তন্ত্রসাধনায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়। এই সকল জিজ্ঞাসার উচিত উত্তর পাইলেই, আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; পরিচয় ঠিকমত পাইলে আত্মসাক্ষাৎকার কঠিন বা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয় না। Theory এবং theory অনুসারে experiment-এর process দুই তন্ত্রে বলা আছে—তত্ত্বও আছে, ক্রিয়াপদ্ধতিও আছে। এই কর্মপদ্ধতি সত্য কি মিথ্যা, তাহা যে করিয়া দেখে নাই, সে কেমন করিয়া বুঝিবে। কাজেই ইহার অধিক আর বলা চলে না।

পঞ্চ 'ম'কার

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহাই তন্ত্রসাধনার পঞ্চ মকার বা পঞ্চ তত্ত্ব। শ্লীলবাদী বাবুরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পঞ্চ তত্ত্বের কি কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, কোন esoteric অর্থ আছে, না উহা সোজাসুজি সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইবে? এই জিজ্ঞাসার সহিত এটুকু ইঙ্গিতও করা হয়, যেন সোজা অর্থে উহা বেজায় মন্দ, ধর্মের নামে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়; উহা Black Art বা কালা বিদ্যা, বামমার্গ বা সজ্জন সমাজের হেয় ব্যাপার। তন্ত্রগ্রন্থসকল পাঠ করিয়া আমাদের যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাতে ত আমরা বুঝি—পঞ্চ তত্ত্বের তিন প্রকারের প্রয়োগ আছে। (১) এক, মোটামুটি সোজাসুজি অর্থ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন বাহ্য পূজায় এবং স্থূল সাধনায় উহার নিয়মিত প্রয়োগ আছে; (২) মানস পূজায় উহার অর্থ স্বতন্ত্র নহে, তবে তাহা কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র; মনে মনে কল্পনা করিতে হইবে যে, আমি সাধক দেবীকে সুরার সাগর, মাংসের পর্বত, মৎস্যের স্তূপ, মুদ্রার সম্ভার দিতেছি এবং পদ্মিনী নারীর সহিত মৈথুন সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতেছি; (৩) ষট্‌চক্রভেদে পঞ্চ তত্ত্বের অর্থ স্বতন্ত্র, প্রয়োগও স্বতন্ত্র, উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা ইসটরিক অর্থ আছে। কিন্তু তন্ত্রের পদ্ধতিমত ষট্‌চক্রভেদ কয় জন করিতে পারে? কয় জন বাহিরের শক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন ঘটাইতে পারে? পারে না—সচরাচর হয় না বলিয়াই উহার সোজা অর্থ ধরিতে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে লজ্জার বা সঙ্কোচের বিষয় কি আছে? তন্ত্রধর্ম প্রচারের ধর্ম নহে, উহা গুপ্ত—গোপ্য সাধনার ধর্ম; যাহার যেমন শক্তি, যাহার যেমন অধিকার, তাহাকে তেমনই কর্মপদ্ধতি দেখাইয়া দিয়া তন্ত্র, জীবমাত্রেরই উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র ভাবের ঘরে চুরি করে না, ভিতরের পর্দা ও বাহিরের পর্দা রাখে না; তুমি যেমন, তোমার প্রবৃত্তি যেমন, তেমনই সাধনপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চ মকারে লজ্জাবোধ করিবার ত কোন হেতু দেখি না।

পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, আত্মশক্তি, উন্মেষ সাধনই তন্ত্রসাধনা। তন্ত্র নিজের দেহস্থ আত্মা ছাড়া অন্য কোন বাহ্য শক্তিকে দেবতা, ঈশ্বর বলিয়া মানে না। তন্ত্র বলেন যে, আমার দেহমধ্যে যে এক জন বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমি বুঝি; তিনি জগৎকে বুঝিতে চাহেন, সৃষ্টি-প্রহেলিকাকে উদ্ঘাটন করিতে চাহেন। তাই অনুমান করিতে হয় যে, যিনি আমার ভিতরে আছেন, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আছেন। আমার ভিতরের ঠাকুরকে আমি চিনিতে পারিলে বাহিরের ঠাকুরটি আপনি আসিয়া ধরা দিবেন। এখন দেখিতে হইবে, আমার ভিতরের ঠাকুরের বিকাশ কেমন করিয়া হয়। আহারে বিহারে, জীবনের উপভোগে ভিতরের ঠাকুরটি যেন একটু জাগিয়া উঠেন। বিশেষতঃ কাম ও মদনের চেষ্টায় ভিতরের ঠাকুরের যেন কতকটা নাগাল পাওয়া যায়; কারণ, কামচর্চার ফলে নরনারীর সংযোগে একটা নূতন জীবের সৃষ্টি হইতেছে। অতএব মৈথুন হইতেই কুণ্ডলিনীর জাগরণের পদ্ধতি অনেকটা বুঝা যায়। তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, সিসৃক্ষা বা সৃজন ইচ্ছা কামের নামান্তর মাত্র। যে পরমাত্মা 'এক আমি বহু হইব' বলিয়া সৃষ্টিপ্রহেলিকার বিকাশ করিয়াছিলেন, সেই পরমাত্মা তোমার দেহস্থ থাকিয়া এক আমি বহু হইবার সাধ অন্য নারীতে উপগত হইয়া মিটাইয়া থাকে। আদি সৃষ্টিতে যেমন আদ্যা শক্তির জাগরনের ফলে বিশ্বাত্মার মনে সিসৃক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই নারী-দেহাভ্যন্তরে আদ্যা শক্তি কুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠিলে, তবে সে নারী পুরুষকে আকর্ষণ করে এবং সেই আকর্ষণের ফলে, স্ত্রীত্ব-পুংত্বের সংযোগে নূতন জীবসৃষ্টি হয়। কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোন স্ত্রীই গর্ভবতী হইতে পারে না, কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোন পুরুষের রেতঃপ্রবাহের সহিত আত্মশক্তির নিঃসরণ হয় না, নারীর জরায়ুতে নব জীবের আধান হয় না। অতএব প্রকৃত মৈথুন-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিতে পারিলে আত্মশক্তির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাই হইল তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের থিওরি বা সিদ্ধান্তকথা। একা তন্ত্র কেন— উপনিষদে, পুরাণে, বৈষ্ণব শৈব সকল শাস্ত্রে এই একই সিদ্ধান্ত নানা ভাবে, নানাপ্রকারের ভাষায় বর্ণিত আছে। অন্য সকল শাস্ত্র যাহা থিওরির হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়া নিরস্ত আছেন, তন্ত্র তাহাকে করিয়া কমিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। এইখানে একটা কথা বলিব। আমাদের দেশে কতকটা হঠযোগের প্রভাবে, কতকটা খ্রীষ্টানধর্মের প্রভাবে নারী বা স্ত্রীজাতি সমাজে যেন একটু নিম্নে স্থান অধিকার করিয়াছেন। অথচ বেদ হইতে পুরাণ তন্ত্র পর্যন্ত সকল ঋষিপ্রণীত

শাস্ত্রই বার বার বলিয়া রাখিয়াছে যে, নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, ধর্মকর্মের সহচরী। বেদের কোন যজ্ঞই পত্নী ব্যতীত হইবার জো নাই; অগ্নিহোত্রী হইতে হইলে পত্নী চাহি। পৌরাণিক ক্রিয়াকর্ম পত্নীর সহিত করিতে হয়; পত্নীসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া তীর্থদর্শন করিলে সে দর্শন ব্যর্থ হয়; শ্রাদ্ধ শান্তিও পত্নীসহ করিতে হয়। শক্তিশূন্য হইয়া কোন যজ্ঞ করিবার উপায় নাই। দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে পতি পত্নী একসঙ্গে লইতে হইবে; জপযজ্ঞ করিতে হইলে পতি পত্নী একসঙ্গে করিতে হইবে; মহানির্বাণতন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভৈরবীচক্রে পত্নীকে শক্তিরূপে পাইলে অন্য নারীর প্রয়োজন হয় না। অন্য নারীকে শক্তি করিতে হইলে শৈব পদ্ধতিমতে তাহাকে বিবাহ করিয়া, পত্নীর পদে বরণ করিয়া, তবে চক্রে বসিতে হইবে। যাহার পত্নী নাই, তাহার কোন বৈধ কর্মে অধিকার নাই; সে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেই পারে না। তাহাকে হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, নহিলে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে বিপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করিতেই হইবে। অবশ্য যদি কোন গৃহীর পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইলে স্ত্রীবিয়োগ হয়, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী কর্ত্রী থাকিতে হইলে তাঁহাকে শৈব মতে বিবাহ করিয়া ঘর সংসার চালাইতে হইবে। ইহাই তন্ত্রের আদেশ। শঙ্করাচার্য নারীকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন, এই হেতু ব্রহ্মানন্দ গিরি শঙ্করাচার্যকে খুব একহাত তিরস্কার করিয়াছেন। তন্ত্রমতে নারীই আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী—জগন্ময়ী—জগজ্জননী; সুতরাং নারী পূজনীয়া, অর্চনীয়া, সাদরে রক্ষণীয়া। খ্রীষ্টানধর্মে নারীকে শয়তানের প্রলুব্ধা জীব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টানধর্ম অনুসারে নারীসঙ্গ শয়তানের প্ররোচনায় হইয়া থাকে। অতএব মেয়েমানুষ ও মৈথুন খ্রীষ্টানধর্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাপাপজ। মনীষী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন যে, খ্রীষ্টানধর্মের এবং হঠযোগী নিষ্কামধর্মীদিগের নারীর প্রতি এই বিতৃষ্ণার ভাব গোড়াকার বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবেই ঘটিয়াছিল। আমরা এ সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে পারি না। কিন্তু মজা এই, যে ধর্ম বা সাধনপদ্ধতিতে নারীর অত্যন্ত নিন্দা আছে, সেই ধর্মের ধর্মিকগণ পরে লাম্পট্যদোষে দুষ্ট হইয়া অধঃপাতে গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতন লাম্পট্যদোষেই ঘটিয়াছিল; খ্রীষ্টানধর্মের অধঃপতনও ঐ লাম্পট্যদোষেই ঘটে। পরে প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রচার হইলে খ্রীষ্টান ইউরোপ একটু সামলাইয়াছিল বটে, পরন্তু আবার

বর্তমান বিলাসপ্রধান সভ্যতার দংশনে আধুনিক ইউরোপে লাম্পট্যের অতিবিস্তার ঘটিয়াছিল। এখন যে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে; তাহার পরিণামে ইউরোপের লাম্পট্যদোষের কতকটা সংবরণ হইতে পারে।

সে যাহা হউক, এই নারীর নিন্দা হইতেই আমরা মৈথুনকার্য্যের নিন্দা করিতে শিখিয়াছি। যে কার্য্যের ফলে জীবসৃষ্টি হইবে, প্রজাবৃদ্ধি হইবে,—প্রজাবৃদ্ধি ও জীবসৃষ্টির জন্যই যাহার বিধান, তাহার নিন্দা করিতে নাই; উহাকে একটা গুপ্ত কাণ্ড বলিয়া উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে নাই। উহাকে চাপিলেই—লুকাইলেই লাম্পট্যের বৃদ্ধি হইবে, লোকে গুপ্ত পিশাচে পরিণত হইবে। কেবল তাহাই নহে, নরনারীর সঙ্গমটাকে জঘন্য ব্যাপার বলিয়া পরিচিত করিলেই, তাহার পর হইতে দুর্বল পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইবে, যথাশাস্ত্র বংশরক্ষা দুষ্কর হইবে। জর্মন মনীষিগণ এইটুকু বুঝিতে পারিয়াই গত কুড়ি বৎসর কাল জর্মনির চিকিৎসকগণ মৈথুনের সায়ান্স-সম্মত পদ্ধতি প্রকাশ্যভাবেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। অধ্যাপক শেঙ্ক ইহার প্রধান ব্যাখ্যাতা। চিকিৎসক ও তত্ত্বজ্ঞগণের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হওয়ায় জর্মন জাতির মধ্যে বন্ধ্যা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; তাই আজ সংখ্যায় জর্মন জাতি ইউরোপের শিরোমণি, কেবল তাহাই নহে, সুপুষ্ট সবলকায় পুত্র কন্যায় আজ জর্মনি পূর্ণ। জর্মনির বিদ্বজ্জনসমাজে জীবসৃষ্টির পদ্ধতির ব্যাখ্যা লজ্জাজনক নহে। আমাদের দেশে যখন তন্ত্রধর্ম প্রবল ছিল, তখন মৈথুনটা গোপ্য, নিন্দনীয় ও জঘন্য ব্যাপার বলিয়া পরিচিত ছিল না। খ্রীষ্টানী বুদ্ধিতে এখন তন্ত্রের পঞ্চ মকারের নিন্দা করিলে চলিবে কেন? আবার মজা এই, যাঁহারা প্রকাশ্যে পঞ্চ মকারের নিন্দা করেন, তাঁহাদের অনেকে ভিতরে ভিতরে এক একজন মিথুন-মাষ্টার। কাহারও পত্নী প্রতি একাদশ মাসের শেষে এক একটি নব কুমার বা কুমারী স্বামিচরণে উপঢৌকন দিতেছেন এবং বর্ষে বর্ষে এমনই উপঢৌকন দিতে দিতে শেষে ক্ষয়রোগে তনু ত্যাগ করিতেছেন। কেহ বা গুপ্তভাবে দুই তিনটি কামপত্নী রাখিয়াছেন: কেহ বা পরনারী দেখিলে নয়নপথে তাহাদের আড়ে গিলিতে চাহেন। তন্ত্রের দৃষ্টিতে এবম্প্রকারের লাম্পট্য অতিপাতক, মহাপাতক বলিয়া পরিচিত। বাহিরের লেপাফাদোরস্ত সাধুতা তন্ত্রের হিসাবে বেজায় দোষের—মহাপাপজ। তন্ত্র ভাবের ঘরে চুরি করিতে, প্রবৃত্তি লইয়া লুকাচুরি করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছেন। তন্ত্র, প্রকাশ্য দুষ্ট নষ্ট নর নারীকে ক্ষমা করিতে পারেন, পরন্তু কপট শঠকে কখনই

ক্ষমা করেন না। তন্ত্র বলেন, গুরুর কাছে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেখাইবে, লজ্জাবোধ করিবে না। তাই তন্ত্র শিষ্যের কাছে—তন্ত্র-পাঠকগণের কাছে কিছুই লুকাইয়া রাখেন নাই। ইহা দোষের নহে, বরং শ্লাঘার বিষয়।

অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, তন্ত্রধর্মের বেজায় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। মানুষের ব্যবহারে ধর্মমত উন্নত হয় বা অধঃপতিত হয়। মানুষ ভাল হইলে ধর্ম ভাল হয়, মানুষ মন্দ হইলে ধর্মকর্মও মন্দ হইয়া যায়। মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দোষে পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই নষ্ট হইয়াছে, মানুষের ব্যবহারের গুণে অনেক সামান্য ধর্ম উন্নত হইয়াছে। জাতির অধঃপতন ধর্মের দোষে ঘটে না। বিলাসে মানুষকে নষ্ট করে, হীন হেয় করিয়া তোলে; মন্দ লোকের প্রভাবে ধর্মও কপটতার আশ্রয় হইয়া উঠে। ধর্মের দোহাই দিয়া কত বিলাসী জাতি যে কত পাপ করিয়াছে, কত পশুত্বের প্রচার করিয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। জাতি বিলাসী না হইলে ধর্ম বিলাসের আশ্রয় হয় না। সুতরাং ধর্মকে নিন্দা করিতে নাই; যেমন মানুষে যে ধর্মের যেমন ভাবে আচরণ করিবে, সেই ধর্ম তেমনই ভাবে ফুটিয়া উঠিবে। মানুষের দোষে তন্ত্রধর্ম নষ্ট হইয়াছে, মানুষের দোষে ভারতবর্ষের অন্য সকল ধর্মও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে এখনও যেখানে সাধনা, যেখানে আরাধনা, সেইখানেই তন্ত্রের প্রভাব পরিস্ফুট। আত্মশক্তির উন্মেষ যিনিই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাকেই তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইসলাম ধর্মের সুফীগণ, খ্রীষ্টান ধর্মের মঙ্কগণ—যাঁহারাই সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ সাধনার একটা পদ্ধতিই এখন পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত, অন্য সকল দেশে অন্য নামে পরিচিত; পরন্তু আসলে সকল দেশের সাধনাই একই রকমের। এই যে পঞ্চ তত্ত্বের বা পঞ্চ মকারের সাধনা, ইহা তান্ত্রিকদিগের মধ্যে যেমন ভাবে প্রচলিত, অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও দেশভেদে ও রুচিভেদে কিঞ্চিৎ আকারান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে। কেহ বা মোটামুটি বাহ্যিক হিসাবে করে, কেহ বা মানস পূজার হিসাবে করে, কেহ বা ষট্‌চক্র ভেদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া করে। আবার তন্ত্রে পঞ্চ মকারের অনুকল্পের ব্যবস্থাও আছে। যথা—সুরার পরিবর্ত্তে ডাবের জল, মিছরির সরবৎ, এমন কি, তাম্রাধারে জল পর্য্যন্ত অনুকল্প বিধান করা হইয়াছে। যাহার যেটা সহে, যাহার যেমন জীবন, যেমন রুচি প্রবৃত্তি, তাহার জন্য তেমনই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তন্ত্র

বলেন—তোমার আত্মা যখন তোমার ইষ্ট, তখন আত্মতৃপ্তির জন্য তুমি যাহা কর, তাহাই ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া করিবে। তুমি মদ্যপান নিয়মিত করিয়া থাক, মদ্যপানে বেশ আনন্দ বোধ করিয়া থাক, অথচ তুমি সুরা নিবেদন করিয়া পান কর না। যদি সত্যই বুঝিয়া থাক যে, মদ্যপান করিলে পাপ হয়, তাহা হইলে উহার পরিহার কর্ত্তব্য। তেমনই মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, যাহাই তুমি উপভোগ করিবে, তাহাই দেবতার প্রসাদ করিয়া খাও,—ইষ্টদেবীকে দিয়া আত্মতুষ্টি সাধন কর। দেবতাকে উপভোগ করাইয়া, অর্থাৎ দেবতাকে নিবেদন করিয়া, প্রসাদবোধে সকল সামগ্রী উপভোগ করিলে, উপভোগের মুখে একটা গণ্ডী পড়ে। মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, সে পশু অবাধে প্রবৃত্তির পথে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারে না। তুমি তখন যেখানে সেখানে মদ্যপান করিয়া বেড়াইতে পারিবে না। যেখানে সেখানে মৎস্য, মাংস, মুদ্রার উপভোগ করিতে পারিবে না। সংযমের পক্ষে ইহা একটা প্রশস্ত উপায়। তন্ত্র বলিতেছেন, তোমার সঙ্গেই তোমার দেবতা ফিরিতেছেন, তোমার দেহাভ্যন্তরেই আছেন। তাঁহাকে তোমার সকল উপভোগ্য সামগ্রী নিবেদন করিতেই হইবে; কারণ, মায়ের ছেলেকে মায়ের প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু খাইতে নাই। যেমন করিয়া প্রসাদ করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি তন্ত্রে লেখা আছে; সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তোমার উপভোগ্য সকল সামগ্রী প্রসাদ করিয়া লইবে। তন্ত্রের এই আদেশ মান্য করিয়া চলিলে, যেখানে সেখানে, যখন তখন মদ্যপান করা বা মৎস্য মাংস মুদ্রার উপভোগ করা চলে না। মৈথুনেরও বেজায় বন্ধন আছে, সে সব জপ তপ করিয়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া লতাসাধনা যে-সে মানুষের কর্ম নহে।

ইহা ত গেল এক পক্ষের কথা। সাধনার হিসাবে, আত্মশক্তির উন্মেষের হিসাবে এই সকল সামগ্রীর একটা উপযোগিতা আছে। যে সাধনার পথে অগ্রসর হয় নাই, বস্তুতত্ত্বের খবর রাখে না, তাহাদের সে উপযোগিতার কথা ভাষার সাহায্যে বুঝান যায় না। আত্মশক্তির উন্মেষ কেবল মনুষ্যদেহেই হয় না, জীব জন্তুর দেহেতেও আত্মার বিকাশ ঘটে, এক একটা অপূর্ব শক্তির উন্মেষ হয়। সাধকের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। তখন সাধকবিশেষকে জীববিশেষের জীবন-সাধন করিতে হয়। যাঁহারা শিবাসাধনা করেন, তাঁহারা শৃগালের ন্যায় কিছু কাল অবস্থিতি করেন। ইহা অঘোরপন্থার কথা। কোথায়—কোন্ জীবে কোন্ আত্মশক্তি

কেমন ভাবে ফুটিয়াছে, তাহা ত আমরা জানি না; যখন যেটা জানিতে পারি, তখন সেইটার সাধন করিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করি। ঠিকমত আয়ত্ত হইলে একটা সিদ্ধির লাভ হয়। এক একটি করিয়া সিদ্ধি সঞ্চয় করিয়া যখন বিশেষ ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায়, তখনই আত্মদর্শন ঘটে, দেহগত আত্মার এবং বিশ্বব্যাপী আত্মার পরিচয় হয়। শক্তি সর্বত্র সমানভাবে ছড়ান আছে,—সর্ববস্তুতে, সর্বপদার্থে শক্তি আছেই। কোথায় সে শক্তির কেমন ক্রিয়া হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিষ্ঠা মনুষ্যদেহে থাকিলে মহাবিষে পরিণত হয়, কিন্তু মাটিতে পড়িলে উহা শ্রেষ্ঠ সার, শূকরের উহা প্রধান ভোজ্য। তোমার পক্ষে যাহা হেয়, অন্যের পক্ষে তাহা শ্রেয়ঃ। অতএব সংসারে হেয় শ্রেয়ঃ কিছু নাই, পাপ পুণ্য কিছু নাই। অবস্থাগতিকে পাত্রের হিসাবে কোনটা কখন বা হেয়, কখন বা শ্রেয়ঃ, কখন বা পাপজ, কখন বা পুণ্যাত্মক। এই সংসারে তোমার আমার বুদ্ধির মাপকাঠিতে যাহা কিছু সদসৎ আছে, তাহাদের মধ্যে যে শক্তি আছেন, তিনিই আদ্যাশক্তি, তিনিই মহামায়া। তাঁহাকে যেখান হইতে পার, সেইখান হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। এই শক্তিসংহরণের নামই সাধনা। মাতাল না হইলে গোটাকয়েক আত্মশক্তির বিকাশ হয় না—তা ভাবেই মাতাল হও, ভক্তিতেই মাতাল হও, কীর্তনানন্দে মাতাল হও, তোমাকে মাতাল হইতে হইবে,—নইলে শক্তির বিকাশ ঘটিবে না। তন্ত্র এক সম্প্রদায়ের সাধকের জন্য সোজাসুজি মদের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। রিরংসা হইতে আর এক শ্রেণীর শক্তির বিকাশ হয়; এ কথাটা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। সহজিয়া বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরীভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া সাধনা—সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। তন্ত্র উহার উপর ভাবের আবরণ রং চড়াইয়া, উহাকে মধুরতর না করিয়া, সোজাসুজি পঞ্চতত্ত্বে মৈথুনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঙ্গিতে যতটুকু পারিলাম—বলিলাম; ইহার অধিক আর বলা যায় না, বলিতে নাই। আবার বলিয়া রাখি, তন্ত্রের মধ্যে শক্তিসাধনার অসাধ্য ও অনন্ত পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। যাহা তোমার ভাল লাগে, তাহা তোমার পক্ষে ভাল; যাহা আমার ভাল লাগে বা উপযোগী, তাহা আমার পক্ষে ভাল। তুমি নিজের পন্থার যশঃ-কীর্তন করিতে পার, আমি আমার পন্থার বিজয় ঘোষণা করিতে পারি; কিন্তু আসলে সব এক, সেই আত্মদর্শনচেষ্টা, ইষ্টের সাক্ষাৎকার।

মানস পূজা

তন্ত্রে বাহ্য পূজা অপেক্ষা মানস পূজার গৌরব অধিক করা হইয়াছে। তন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানস পূজাই সার পূজা, বাহ্য পূজা মানস পূজার অবলম্বনস্বরূপ। তন্ত্রের ভূতশুদ্ধি প্রকরণে লিখিত আছে—

"সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।
অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ॥
"সকৃৎ পূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ।
কিং তস্য বাহ্যপূজায়াং সর্বং ব্যর্থং কদর্থনম্॥"

অর্থাৎ সর্ববিধ বাহ্যপূজাতেই অন্তঃপূজার বিধান আছে, অর্থাৎ বাহ্যপূজা করিতে হইলেই অন্তঃপূজাও করিতে হইবে। হে মহেশ্বরি! এক বার কৃত অন্তঃপূজা কোটি বাহ্যপূজার ফল প্রদান করে। গন্ধর্বতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—

"মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি।
যো নরো ভক্তিসংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভবেৎ॥'

যে মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করে, সে দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। এই তত্ত্বটা বুঝাইতে যাইয়া তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের দেহগত আত্মশক্তিই মহাদেবী পরমেশ্বরী। জীবনরূপ যে প্রহেলিকা, ইহা তাঁহারই লীলা; তিনি দেহে বিদ্যমান আছেন বলিয়া জীবদেহ সজীব ও সচল আছে; তাঁহার শক্তিপ্রভাবেই দেহের অনুভূতি, আসক্তি, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি গুণসমূহ পরিস্ফুট এবং ক্রিয়াশীল থাকে। দেহগত পরামাত্মা ছাড়া বাহিরে আর কোন দেবতা নাই; দেহের পরমাত্মাই আমাদের উপাস্য দেবতা, হৃদয়নাথ, জীবনসর্বস্ব।

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া।
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিঃস্থাং পূজয়েচ্ছিবাং॥"

অর্থাৎ আত্মস্থ বা স্বশরীরস্থ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ দেবতার অনুসন্ধান করা যেন করস্থ কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচখণ্ডের প্রাপ্তি

ইচ্ছার তুল্য ; অতএব হৃদয়ে ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে বহিঃস্থ দেবতার পূজা করিবে। কেন না, বহিঃস্থ দেবতা হৃদয়ের ইষ্ট দেবতার অবলম্বনস্বরূপ ; হৃদয়ে দেবতাকে স্থির রাখিতে পারি না বলিয়াই বাহিরে একটা দেবপ্রতিমার পরিকল্পনা করিয়া লইতে হয়। এই কথাটি বলিয়া তন্ত্র অন্তর্যাগের ব্যবস্থা বলিয়াছেন! স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন যে, অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থে যে পূজাপদ্ধতি লিখিত বা বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই অন্তর্যাগের অনুকল্পস্বরূপ। যে সাধক অন্তর্যাগ করিতে পারে, তাহার পক্ষে বাহ্যপূজার কোন প্রয়োজন নাই। অন্তর্যাগ শব্দের অর্থ মনে মনে পূজা। এই মানস পূজায় সিদ্ধ হইলে তবে সাধক ষট্‌চক্র ভেদ করিবে, হৃদয়ে ভৈরবীচক্র বসাইবে এবং সিদ্ধ হইবে। প্রথমে জপ ও পুরশ্চরণ, পরে মানস পূজা, তাহার পর সাধনা এবং ষট্‌চক্রভেদ, শেষে মাতৃদর্শন ও সিদ্ধি। এই মানস পূজাটি কি ও কেমন, তাহাই প্রথমে বলিতে হইবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে অন্তর্যাগের পদ্ধতি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে।

'শুভ আসনে পূর্বাস্য কিংবা উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া স্বীয় হৃদয়ে সুধাসমুদ্রের ধ্যান করিবে। সেই সমুদ্রের মধ্যভাগে সুবর্ণবালুকাময় বেলাভূমি বলয়িত, বিকসিত কুসুমান্বিত, মন্দার ও পারিজাতাদি পুষ্পবৃক্ষপরিবৃত এবং পুষ্প ও ফলসমন্বিত বৃক্ষে পূর্ণ রত্নদ্বীপ বিরাজ করিতেছে। এই রত্নদ্বীপের চতুর্দিকে নানাবিধ কুসুমগন্ধে আমোদিত, ভ্রমরকুল যেখানে বিকসিত কুসুমামোদে প্রহৃষ্ট, সুমধুর কোকিলগানে প্রতিধ্বনিত, বিকসিত সুবর্ণপঙ্কজসকল যাহার অসংখ্য সরোবরের শোভাবর্ধন করিতেছে এবং যে রত্নদ্বীপের চারি দিগে চারিটি তোরণে মৌক্তিকমালা ও কুসুমমালায় শোভিত। এই রত্নদ্বীপের মধ্যস্থানে চতুর্বেদরূপ চতুঃশাখাবিশিষ্ট, সত্বাদি গুণত্রয়সমন্বিত, পীত কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত হরিত এবং বিচিত্রবর্ণের পুষ্প বিরাজিত। কোকিলভ্রমরাদিবিমণ্ডিত কল্পপাদপের ধ্যান করিবে। এই কল্পবৃক্ষের তলে রত্নবেদিকার ধ্যান করিবে। অনন্তর তদুপরিভাগে বালারুণের ন্যায় রক্তবর্ণ, রত্ননির্মিত সোপানাবলীসংযুক্ত, ধ্বজযুক্ত চতুর্দ্বারান্বিত নানারত্নালঙ্কারশোভিত রত্ননির্মিত প্রাকারবেষ্টিত, স্বস্বস্থানস্থিত লোকপালগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত, ক্রীড়াশীল সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব বিদ্যাধর মহোরগ কিন্নর এবং অপ্সরোগণ পরিব্যাপ্ত, নৃত্য এবং বাদ্যনিরত সুরসুন্দরীগণযুক্ত, কিঙ্কিণী জালযুক্ত ; পতাকা অলঙ্কৃত, মহামাণিক্য বৈদূর্য ও রত্নময় চামরভূষিত লম্বমান স্থূলমুক্তাফলাঙ্কিত, অচন্দন, গুরু ও কস্তুরী দ্বারা বিলিপ্ত সুমহৎ

রত্নমণ্ডপের ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে মহামাণিক্যবেদিকার ধ্যান করিবে এবং এই বেদিকার অভ্যন্তরে প্রাতঃসূর্যকিরণারুণপ্রভ, চতুষ্কোণশোভিত ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক সিংহাসনে ধ্যান করিবে। তৎপরে ন্যাস করিয়া পীঠপূজা করিয়া সেই আসনে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান ধ্যান করিবে। তৎপরে মনে মনে ভগবতীকে রত্নপাদুকা দান করিয়া তাঁহাকে স্নান মন্দিরে আনয়ন করিবে এবং কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, মৃগমদ, রোচনা ও কুঙ্কুমাদি নানা গন্ধদ্রব্য সুবাসিত জল দ্বারা দেবীর সর্বশরীরোদ্বর্তন করিয়া তাহাতে তৈল লেপন করিতেছি, ইহা মনে করিবে। তাহার পর নিজের ছোট মেয়েটিকে যে ভাবে তাহার গাত্র-মার্জন করিয়া স্নান করাইয়া থাক, সেই ভাবে স্নান করাইবে। পরে গাত্রমার্জনপূর্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে। ইত্যাদি প্রকারে দেবীর স্নানাদিকার্য সমাপন করিয়া, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করাইয়া রত্নবেদীর উপর আনিয়া বসাইবে। তাহার পর পূজা। বাহ্যপূজায় যে সকল বস্তুর ও উপচারের প্রয়োজন, মানস পূজাতেও সেই সকলেরই ব্যবহার করিতে হয়। মানস নেত্রে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, পঞ্চ প্রদীপ লইয়া যথাবিধি মায়ের আরতি করিতেছি, বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতেছি : ধ্যান এতই প্রগাঢ় হইবে যে, সে বাদ্যভাণ্ডের শব্দ যেন কানে শুনিতে পাইব ; সে ধূপধুনার গন্ধ যেন নাসিকায় আঘ্রাণ করিতে পারিব, আর দেখিতে পাইব, যেন ইষ্টদেবী আমার আরতির ভঙ্গী দেখিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছেন এবং আমার পূজা ও সেবা গ্রহণ করিতেছেন।' ধ্যানে সিদ্ধ না হইলে এমন মানস পূজা ঠিকমত হয় না। বাহ্য জগৎকে ভুলিয়া, বাহ্য জগতের শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি অনুভূতিসকলকে ভিতরে টানিয়া কেন্দ্রীকৃত রাখিয়া তবে মানস পূজা করিতে হয়। যে মানস পূজায় ব্রতী হয়, যত ক্ষণ পূজা চলে, তত ক্ষণ তাহার বাহ্য জ্ঞান থাকে না, সে পূজার আনন্দেই আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ যখন 'মন, তোমার ভ্রম গেল না, কালী কেমন তা কি জেনেও জানলে না' রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি মানস পূজাতেই রত ছিলেন ; কারণ ঐ গানের শেষের কয়টা চরণেই তিনি মানস পূজার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক নিরাকারবাদী ব্রাহ্মগণ তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি জানেন না বলিয়া, কোন্ অবস্থায়—সাধনার কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া সাধকগণ কোন্ কথা বলেন, তাহা বুঝেন না বলিয়া, রামপ্রসাদের এই গানটি তুলিয়া নিজেদের নিরাকারবাদের সমর্থন করিয়া থাকেন।

এই মানস পূজা কেবলই যে তান্ত্রিকগণ করিয়া থাকেন, তাহা নহে ; শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের সাধক মাত্রেই মানস পূজা করিতে বাধ্য, নহিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, ইষ্টদর্শন সম্ভবপর হয় না। তান্ত্রিক শাস্ত্রের ইষ্টদেবী ভগবতী, বৈষ্ণব সাধকের ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ ; কেবল ইষ্টদেবতার পার্থক্য আছে, তাহা ছাড়া পূজাপদ্ধতির পার্থক্য বড়ই কম। শাক্ত বলিদান করে, অন্য সাধকে কোন বলিই দেয় না, কোষাকুষি তাম্রপাত্র ব্যবহার করে না ; কিন্তু মোটের উপর পূজার ক্রম এবং পদ্ধতি সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণের একই রকমের ; ষোড়শোপচার আছে, কেবল উপচারের নির্দেশবৈষম্য ঘটিতে পারে। যাউক সে কথা, এই ভাবে মানস পূজা করিতেই হইবে। কারণ, তন্ত্রের মহাবাক্য এই যে—'বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং'—হে দেবি, উপাসনা না করিলে মনুষ্য কোন ফলই লাভ করিতে পারে না—সকল উপাসনার সার মানস পূজা, হৃদয়ের উপাসনা ; সুতরাং মানস পূজা প্রত্যেক সাধকেরই অবশ্য কর্তব্য।

উপাসনা কি ও কেমন ? উপাসনার অর্থ সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্যা। যাহা আমি ভালবাসি, অন্যে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে আমি পরিতুষ্ট হই, তাহা এবং সেই ব্যবহারের দ্বারা অন্যের পরিচর্য্যার নামই উপাসনা। ইষ্টদেবতার উপাসনাও সেই প্রকারের। যে ফল মূল, গন্ধদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, রত্নালঙ্কার আমি ভালবাসি, সেই সকল আভরণ ভূষণ দিয়া ইষ্টদেবতার বেশবিন্যাস করিয়া, ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া যে পূজাপদ্ধতি, তাহাই উপাসনা। মানস পূজায় আরও একটু মজা আছে। যাহা আমি পাইলে আমার সাধ মিটে, যেমনটি হইলে আমার আশা পূর্ণ হয়, তেমন সামগ্রী আহরণ করিয়া এবং তেমন অবস্থার উপকল্পনা করিয়া মানস পূজা করিতে হয়। মানস পূজার কোন সাধ অপূর্ণ রাখিতে নাই। বাহ্যপূজকই হউক বা মানস পূজকই হউক, সাধক মাত্রেই প্রসাদভোজী, ইষ্টদেবতার দাসানুদাস। তাই রামপ্রসাদ পদে পদে বলিয়াছেন—'আমি তুয়া দাস-দাসদাসীপুত্র হই।' ইষ্টদেবতাকে সর্বস্ব নিবেদন—আত্মনিবেদন করিয়া তবে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। আমার ঘর সংসার, পুত্র পরিবার, ধন জন, অর্থ সম্পত্তি, ইহ সংসারে যাহা কিছু আমার, সে সবই আমার ইষ্টদেবতার। আমি তাঁহার প্রসাদভোজী, কৃপার পাত্র, ভৃত্য মাত্র। হিন্দু সাধক দর্প দম্ভ করিতে হইলে দেবতার নামে করিয়া থাকে, আমোদ প্রমোদ করিতে হইলে দেবতার উদ্দেশে

করিয়া থাকে। হিন্দু সাধক কখনই বলিবে না যে, আমার সংসার, আমার ঘরবাড়ী, আমার ধন দৌলত। যাহার গৃহে যে দেবতার অধিষ্ঠান আছে, সে সেই দেবতার দোহাই দিয়া কথা কহিয়া থাকে। যাহার গৃহে দামোদর আছেন, সে দামোদরের নাম করিয়া বলে—দেখা যাউক, দামোদর কি করেন ; যাহার লক্ষ্মী জনার্দন, সে তাহারই দোহাই দেয়। হিন্দু সাধক কখনই বলে না যে, আমার অমুক সামগ্রীর প্রয়োজন বা অমুক সামগ্রী খাইব। সে প্রসাদ পায়, ইষ্টদেবতাকে স্বীয় ইপ্সিত ফল নিবেদন করিয়া, স্বীয় সখের পোষাক পরাইয়া সে প্রসাদস্বরূপ তাহা গ্রহণ করে। সাধক যখন এই ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে, নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া ইষ্টদেবতার সংসার গড়িয়া তুলিতে পারে, তখনই সে মানস পূজার অধিকারী হয় ; কারণ, তাহা না করিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সমাজ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তবে সাধক যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। যত দিন সমাজে থাকিবে, তত দিন সমাজধর্ম মানিয়া তাহাকে চলিতেই হইবে।

তন্ত্রসকল পাঠ করিলে মনে হয়, উহার যেন তিনটা স্তর আছে। প্রথম বাহ্যপূজার স্তর, দ্বিতীয় মানস পূজার স্তর, তৃতীয় শক্তিসাধনার স্তর। বাহ্য ও মানস পূজার ক্রম এবং পদ্ধতি আমরা কতকটা বুঝিতে পারি, পরন্তু সাধনার স্তর একেবারেই বুঝিতে পারি না। মনে হয় উহা গুরুমুখ না করিয়া বুঝিলে, সিদ্ধ সাধকগণের অপূর্ব শক্তির বিকাশ না দেখিলে সাধনার স্তর একেবারেই বুঝা যায় না। বাহ্যপূজা যে মানস পূজার রোচক, তাহা তন্ত্র বার বার বলিয়াছেন। কিন্তু ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা, ভৈরবীচক্র প্রভৃতি যে কি ও কেমন, তাহা সোজাসুজি গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় না। কারণ, বাহ্যপূজার জন্য যেমন ষট্‌চক্রভেদ ও প্রাণায়াম নির্দিষ্ট আছে, মানস পূজাতেও তেমনি ষট্‌চক্রভেদ এবং প্রাণায়ামের নির্দেশ আছে, হোমেরও ব্যবস্থা আছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল বুঝিয়া উঠা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মানস হোমের একটা দৃষ্টান্ত দিব ; তন্ত্র বলিতেছেন যে,

'অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ।
অন্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
এতদ্রূপস্তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ।
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াঙ্কিতং॥
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ।

বাম ভাগে নাড়ীমীড়াং দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নামধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি ॥"

ইহার সোজাসুজি অর্থ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না।

"নাভৌ চৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা শ্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তিং জুহোম্যহম্ ॥

*   *   *

ধর্মাধর্মৌ হবির্দীপ্তমাত্মাগ্নৌ মনসা শ্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যং ব্রহ্মবৃত্তিং জুহোম্যহম্ ॥"

সোজাসুজি এই সকল এবং পূর্বেকার শ্লোকের বাঙ্গালা এই হইবে,—আধারপদ্মে চিদগ্নিতে হোম করিবে। অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, এতদাত্মত্রিতয়াত্মক চতুষ্কোণ আনন্দরূপ মেখলা ও বিন্দুরূপ ত্রিবলয়যুক্ত নাদবিন্দুরূপ যোনিযুক্ত চিৎকুণ্ডের চিন্তা করিবে। তাহার পর এই কুণ্ডের দক্ষিণে পিঙ্গলা, বামভাগে ঈড়া এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিয়া ধর্ম এবং অধর্মরূপ কল্পিত হবির্দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে। ইহার সোজাসুজি অর্থ করা যায় না, অথচ এই মানস পূজাকে লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ গান করিয়া গিয়াছেন যে, "ধর্মাধর্ম দুটো অজা জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি।" বুঝা যায় না বটে, পরন্তু গুরূপদিষ্ট হইয়া কর্ম করিতে থাকিলে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায়। কথাটা এই,—আমরা পুরাণ তন্ত্রের ভাষা ঠিকমত বুঝিবার অধিকার হারাইয়াছি। সে সমাজ নাই, সমাজের সে পুরাতন আচার ব্যবহার নাই, রীতি পদ্ধতি নাই; যে সকল কথা সবাই জানিত, সবাই বুঝিত, সে সকল কথা আমরা এখন বুঝিতে পারি না, ধরিতে পারি না। আজ যদি সহসা একটা বিপ্লব বাঙ্গালায় ঘটে, ইংরেজী-জানা মানুষ মাত্রেই যদি মরিয়া যায় বা অবহেলায় ও অবজ্ঞায় সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে পরে যেমন বাঙ্গালার আজকালকার সর্বজনবোধ্য কথা অনেকেই বুঝিতে পারিবে না, তেমনি তন্ত্রের সাহিত্যের দশা ঘটিয়াছে। উহা বুঝিবার বা বুঝাইবার লোক প্রকট নাই। তবে জগদম্বার কৃপায় মান্যবর বিচারপতি উডরফ সাহেব তন্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, অনেকগুলি তন্ত্রের গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাই সভ্যসমাজে তন্ত্রের উল্লেখ আবার করিতে পারিতেছি। প্রত্যেক তান্ত্রিকেরই দৃঢ় বিশ্বাস্ এই যে, মায়ের কৃপা হইলেই তন্ত্র প্রকট হন,

মায়ের বিরাগ জন্মিলেই উহা সংহৃত হইয়া যায়। তান্ত্রিক, জীবনের সকল ব্যাপারে মায়ের তর্জনীহেলন দেখিতে পায়, তাই তান্ত্রিক সর্বাবস্থায় পরিতুষ্ট। একটা ইতিহাসের কথা এইখানে বলিয়া রাখিব:—রাজা রামমোহন রায় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, তিনি শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন অর্থাৎ শক্তিসাধনা করিতেন। তিনি তন্ত্রের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া নিরাকার উপাসনার পদ্ধতি প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন! মহানির্বাণতন্ত্রের গোড়ার কয়টা উল্লাসে, অনেকের বিশ্বাস—তিনি তাঁহার মনোমত অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু খ্রীষ্টানী শিক্ষায় ও ভাবের বন্যায় তন্ত্র ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার ভাবের গতি ফিরিতেছে, তাই তন্ত্রের কথা অনেকে কহিতেছেন। এখনও একটু হিসাব করিয়া পাঠ করিলে তন্ত্রে অনেক প্রগাঢ় তত্ত্বের কথা জানা যায়। বিশেষতঃ পুরাতন বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে তন্ত্রের অনেক কথা বুঝিতেই হইবে। এই মানস পূজা বুঝিতে না পারিলে রামপ্রসাদ, দাওয়ান মহাশয়, নীলাম্বরপ্রমুখ সাধকগণের গানের কোন অর্থই ঠিকমত বুঝা যাইবে না। তাই মানস পূজার গোড়ার গোটাকয়েক মোটা কথার উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। তন্ত্র যে কেবল বাহ্যিক পূজাপদ্ধতি নহে, ভক্তির আকর, তাহা মানস পূজার আলোচনা করিলেই বেশ জানা যায়। উহা লম্পটের ধর্ম নহে, মূর্খেরও ধর্ম নহে। উহা জ্ঞানী পণ্ডিতের সাধনাপদ্ধতি।

তন্ত্রে মূর্তিপূজা

১

আমাদের বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণেরও মত এই যে, বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পূর্বে ভারতবর্ষের আর্য্য বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে আধুনিক হিসাবের মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। বৈদিক ধর্মের প্রাবল্যের যুগে দ্বিজাতি মাত্রেই যাগ যজ্ঞ করিতেন, গৃহে গৃহে অগ্নিহোত্রী বিরাজ করিতেন, বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য সর্বব্যাপী হইয়াছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডে মূর্তিপূজা নাই, মীমাংসা শাস্ত্রে প্রতিমা নির্মাণের এবং প্রতিমা পূজার কোন পদ্ধতির উল্লেখ নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষব্যাপী

হইলে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তির পূজা এ দেশে প্রথম প্রচলিত হয়। পরে বৌদ্ধ মহাযানী তান্ত্রিকগণ প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, নীল সরস্বতী প্রভৃতির পাষাণময়ী মূর্তি গড়াইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। তবে তাঁহারা গৃহে গৃহে উৎসব উপলক্ষ্যে মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করিতেন না। তাঁহারা মন্দির গড়াইয়া, সেই মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং বৌদ্ধ নরনারীসকল প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা মন্দিরে যাইয়া দেবতার পূজা আরতি করিয়া আসিতেন। তাহার পর বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতন ঘটিলে যে নব হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি হয়, সে ধর্মের ধার্মিকগণ বৌদ্ধ প্রথা অনুসরণ করিয়া মন্দিরে বা মঠে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করিয়া আসিতেন। বৌদ্ধ যুগাবসানের পর সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নাটক নাটিকা লিখিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তকে মন্দিরে যাইয়া পূজার পদ্ধতির উল্লেখই আছে। এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই বাঙ্গালার মতন মাটির মূর্তি গড়াইয়া পূজা করা হয় না। মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা বাঙ্গালায় যেরূপ সাধারণ ভাবে প্রচলিত, এমন মূর্তিপূজার প্রচলন ভারতবর্ষের আর কোন দেশে বা জাতির মধ্যে নাই।

দুই চারি জন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্রধর্ম বৈদিক ধর্মের মতন পুরাতন এবং সনাতন। শিবলিঙ্গপূজা কেবল ভারতবর্ষে কেন—এশিয়া, ইউরোপ এবং আফরিকায় বহু দেশেই বহু যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রচলিত আছে। পুরাতন ফিনিক্, মিশরের কপ্‌ট বা গুপ্ত জাতি, রোমক, যবন, অসুর প্রভৃতি বহু পুরাতন জাতির মধ্যে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। পুরাতন বাবিলনে ও তাতার দেশে লিঙ্গপূজা হইত। বাবিলনের মলছ, বাল প্রভৃতির পূজা কতকটা তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির মতন। অনার্য বর্বর জাতিসকল ত অনাদি কাল হইতে ভূত প্রেত ও মূর্তিপূজা করিয়াই আসিতেছে, আর্য জাতির বহু শাখার মধ্যে মূর্তিপূজা বা প্রতীকপূজার প্রচলন ছিল। অতএব বলিতে হয় যে, যাগ যজ্ঞ, হোম জপ যেমন সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, প্রতিমা বা প্রতীকপূজাও তেমনি সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে। সুতরাং নিগমাগম বা তন্ত্রের ধর্ম বৈদিক ধর্মের সমসময় কালের বলিলেও চলে। বোধ হয়, বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা পুরাতন হইলেও হইতে পারে। এই সকল প্রত্নতত্ত্ববিদদিগের বিশ্বাস যে, শ্বেতাঙ্গ আর্যদিগের উদ্ভবের সময়ে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণাঙ্গ আর্যও এক দল ছিল। বেদে কৃষ্ণাঙ্গ আর্যদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা ইরান বা পারস্য দেশ হইতে বাহির হইয়া বর্তমান

কাবুলের উত্তর উপত্যকা বাহিয়া, তাগ্‌লা-মাকান অধিত্যকা হইতে কাশ্মীরে নামিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ; পরে কাশ্মীর হইতে পার্বত্য প্রদেশ বাহিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দিকে গান্ধার সুবাস্তু হইয়া লাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ পর্যন্ত ইহাদের বিস্তার ঘটিয়াছিল। ইহারাই নাকি ভারতবর্ষে তন্ত্রধর্ম আনয়ন করে, ইহারাই আদিম বর্বরগণের পৌত্তলিকতা তন্ত্রধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লয়। সুতরাং এই অনুমান বা থিওরি সত্য হইলে বলিতে হয় যে, মূর্তিপূজা বৈদিক যজ্ঞধর্মের সমসময়ের এবং সনাতন।

কিন্তু খ্রীষ্টানগণ এবং মুসলমানগণ যাহাকে idolatry বা বোধপরস্ত বলেন এবং যাহার নিন্দা করেন, তাহা কিন্তু বেদেও নাই, তন্ত্রেও নাই। উহা ষোল আনা বৌদ্ধ পৌত্তলিকতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। বোধ-পরস্ত শব্দটা হইতেই ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। Idolatry শব্দটার ইতিহাস জানিতে পারিলে ঐ বৌদ্ধ পৌত্তলিকতার বা বর্বর পৌত্তলিকতার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। কোন তন্ত্রে পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি পূজার বিষয়ীভূত নহে ; উহারা প্রতীক, আলম্বন, ধ্যানের সহায়ক মাত্র। তবে সাধু মহাত্মার প্রতিমূর্তি, তাঁহার চিহ্ন বা স্মারক হিসাবে পূজ্য এবং সেব্য। যেমন শাক্য-সিংহের, জামদগ্ন্যের, জড় ভরতের, দত্তাত্রেয়ের প্রতিমা পূজা করিতে হয়—প্রতিমারই হিসাবে, সাধু সজ্জনের প্রতিমূর্তির হিসাবে, প্রতীক বা আলম্বনের হিসাবে নহে। এ ক্ষেত্রে প্রতিমাই পূজ্য ; কেন না, ঐ সকল সাধু মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্যই তাঁহাদের প্রতিমা গড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে। পরন্তু ঈশ্বরোপাসনায় যে প্রতিমার পূজা করিতে হয়, তাহা প্রতীকের হিসাবেই করিতে হয়। কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে,—

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥'

এই শ্লোক রামতাপনীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। কুলচূড়ামণি গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপই এক। যেমন জমা ঘি এবং তরল ঘি, দুই-ই ঘৃত, কেবল অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি চিন্ময় ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম দুই একই রূপ। কারণ, পূজক যিনি, তিনি আত্মাবান্ পুরুষ, তাঁহার সোপাধিক আত্মা পরমাত্মার সহিত মিশিতে চাহে, তাই সে উপাসনা করিতে উদ্যত হয়। সেই উপাসনার সহায়তার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে হয়। যেমন কোদাল কুড়ুল লইয়া বন কাটিয়া রাজপথ তৈয়ার করিতে হয়, তেমনই

প্রতিমা, পূজার উপচার, পত্র পুষ্প, ফল গন্ধদ্রব্য, বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে উপাসকের ভক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হয়। তস্মাৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রীপুংরূপং ধত্তে। ইহাই হইল তন্ত্রের মূর্তিপূজার গোড়ার কথা।

ইহার উপর তন্ত্র দুইটা theory বা সিদ্ধান্ত কথা বলিয়াছেন। প্রথম থিওরি,—'দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।' অর্থাৎ দেবতার শরীর বীজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই ইষ্টদেবতার মূর্তিকে মন্ত্রঘটকীভূতা প্রতিমা বলা হয়। মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহঘটে বা হৃদয়ের মধ্যে বা চিন্তাক্ষেত্রে এক একটা মূর্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই মূর্তিই সাধকবিশেষের ইষ্টদেবতার মূর্তি, তাহার আরাধ্য, তাহার উপাস্য। এই প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া তন্ত্র বলিয়াছেন,—'বর্ণরূপেণ যা দেবী জগদাধাররূপিণী।' যামলে লেখা আছে যে, ধ্যান দুই প্রকারের—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; 'সূক্ষ্মং মন্ত্রময় দেহং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্'। সূক্ষ্ম ধ্যান মন্ত্রময়, মন্ত্রজপ এবং মন্ত্রের উপর একাগ্রতা, ইহা বড় কঠিন, কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। স্থূল ধ্যান বিগ্রহচিন্তা—রূপের ধ্যান। এই ধ্যানই সাধারণ সাধকে করিতে পারে এবং এই ধ্যানে সিদ্ধ হইলে সাধক আপনা আপনি সূক্ষ্মতত্ত্বে যাইতে পারে। অতএব তন্ত্র আদেশ করিতেছেন যে, 'তস্মাৎ বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ'—বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিয়া, ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মময় হইতে পারে।

দ্বিতীয় theory বা সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গের—উপাসনাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত। বড় সাধ এই হয় যে, জগদীশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে মাতা, পিতা, গুরু, প্রভু, সখা বলিয়া ডাকি, তাঁহাকে সেইরূপে দেখিতে থাকি। আমার হৃদ্গত একাদশ আসক্তির তৃপ্তির জন্য আমি বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে চাহি। এই পিপাসা—এই উপাসনার তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য যে পূজাপদ্ধতির নির্দেশ আছে, তাহাতে দেবতার রূপ পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে। সে রূপ বাঙ্ময় রূপ হইতে পারে, চিত্রলেখা হইতে পারে, ধাতুনির্মিত বা পাষাণ ও মৃত্তিকানির্মিত হইতে পারে। ইহা রসের রূপ—ভাবের রূপ। এই রূপে ভক্তি কেন্দ্রীকৃত হইলে, একনিষ্ঠার বিকাশ হইলে, সাধকের পরিতৃপ্তি সাধন হয়, তিনি সদানন্দ লাভ করিতে পারেন। স্তব স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে, ভাষার সাহায্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে একটা রূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে, একটা রূপের ছাপ হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়ই। এই ছাপ, এই আলেখ্য প্রতিমায় পরিণত হইলে উহা

দেবতার বিগ্রহ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রামায়ণ ও ভাগবতাদি গ্রন্থের বর্ণনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশভেদে, রুচিভেদে, কলাকৌশলের প্রকারভেদে এই সকল মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পূজা ও উপাসনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া, ভাবোন্মেষের প্রধান সহায় বলিয়া, জনসমাহারের প্রধান উপায় বলিয়া এই সকল মূর্তি শ্রদ্ধার সামগ্রী। তাই তন্ত্র বলিতেছেন,—'যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।' সাধকের অভিমত বা রুচি প্রবৃত্তি অনুসারে এক এক দেবমূর্তি তাঁহার ইষ্টদেবতা হইয়া থাকে। ইহা প্রবৃত্তিমার্গের ও অধিকারতত্ত্বের কথা। নিবৃত্তিমার্গের কথা স্বতন্ত্র।

এইবার তন্ত্রের প্রথম থিওরির বা সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিব। কথা এই যে,—বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবতাবিশেষের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ যথাপদ্ধতি বীজমন্ত্র অনবরত জপ করিলে স্বয়মের একটা মূর্তির বিকাশ মনোমধ্যে হইয়া থাকে। যেমন একটা ধাতুপাত্রে জল থাকিলে এবং সেই ধাতুপাত্রের পার্শ্বের কোন স্থানে আঘাত করিলে জলে একটা কম্পন হয় এবং কম্পনজনিত একটা রূপের প্রকাশ হয়; অথবা একটা থালায় অল্প কিছু সূক্ষ্ম বালুকাকণা থাকিলে এবং সে থালার তলায় আঘাত করিলে আঘাতজনিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বালুকাকণাগুলি নড়িয়া, ঘুরিয়া, ছুটিয়া একটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে, তেমনই আসন করিয়া বসিয়া বীজমন্ত্র একনিষ্ঠভাবে জপ করিতে থাকিলে মনোময় আস্তরণে একটা রূপের বিকাশ হইয়া থাকে। তন্ত্র বলেন যে, প্রত্যেক শব্দেরই একটা রূপ, একটা আকার আছে। সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরের একটা রূপ আছে; সেই রূপ সেই সুরের দেবতা। সেই সুর আলাপ করিতে করিতে যতক্ষণ না মনোমধ্যে উহার রূপের বিকাশ হইতেছে, ততক্ষণ সে সুরে সিদ্ধ হওয়া যায় না। আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্র এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন এবং ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রূপের নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, সপ্ত স্বরেরও ভিন্ন ভিন্ন পরদায় রূপের নির্দেশ আছে। বাহ্য জগতে রূপ ফুটিবার পূর্বে শব্দ ফুটিয়া উঠে। তন্ত্র বলেন,— প্রথম প্রভাতে অরুণোদয়ের পূর্বে নিসর্গ-সুন্দরীর সর্বাঙ্গে প্রণবের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়, তবে মুদ্রিতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের কনকরেখা আকাশক্রোড়ে ফুটিয়া উঠে। অতি ঘোর অমানিশায়, দ্বিযামার পরে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা শ্মশানক্ষেত্রে হুঙ্কারের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; সে শব্দ না

হইলে নিশার তমোময় রূপ ফুটে না। প্রকৃতির সকল অবস্থায় একটা করিয়া শব্দ আছে, আর সেই শব্দের এরূপ একটা রূপ আছে; প্রত্যেক ঋতুর রূপ আছে, ত্রিসন্ধ্যার রূপ আছে। এ রূপ যে কেবলই মানব মানবীর রূপ, তাহা নহে; অন্য নানা রূপের অবস্থানুসারে বিকাশ হইয়া থাকে। তবে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে প্রায়শঃ মানব মানবীর রূপের বিকাশ হয় বলিয়াই, মানুষের অনুভূতিগম্য যাহা, তাহার রূপ অনেক সময়ে নরনারীর রূপের মতন একটা কিছু রূপ হয়। তন্ত্র বলেন, মানুষের দেহ একটা শব্দযন্ত্রবিশেষ। বহু তন্ত্রে নরদেহকে বীণার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বীণার বহু তার টানা বাঁধা থাকে, দেহের মধ্যেও বহু তার, তন্ত্র, তাঁত, নাড়ীর আকারে টানা বাঁধা আছে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে, আসক্তির সাহায্যে গুরু সেই দেহগত বীণা-যন্ত্রকে একটা সুরে, একটা গ্রামে বাঁধিয়া দেন। সাধক সেই বাঁধা যন্ত্রে বীজমন্ত্রের আলাপ করিয়া থাকেন। আলাপ করিতে করিতে যখন সুর বেশ জমিয়া যায়, একটা শব্দবিভূতির সৃষ্টি হয়, তখন সেই বিভূতির অভিব্যঞ্জনাস্বরূপ একটা রূপের ছবি মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠে। ইহাকেই বলে—ধ্যানসিদ্ধ মূর্তি। সাধকবিশেষে, রুচিবিশেষে, মন্ত্র জপের পদ্ধতি অনুসারে এই ধ্যানসিদ্ধ মূর্তিসকল নানা ভাবে প্রকট হইয়া থাকে। তাই যামলে বলা হইয়াছে,—'ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথগ্বিধম্।' তন্ত্র বলেন, যেমন সকল বীণায় রাগ রাগিণী সমান ভাবে ধ্বনিত হয় না, নির্মাতার নির্মাণকৌশল অনুসারে শব্দ ও সুর ধ্বনিত হয়, তেমনি দেহ হিসাবে, পিতামাতার প্রকৃতি অনুসারে, বংশের ধারা অনুসারে, রূপের বিকাশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হইয়া থাকেন যেমন বাজারের বেহালা এবং Stradivarius বেহালায় আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে, একখানা ষ্ট্রাড বেহালার মূল্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে, সে বেহালার শব্দ গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে, তেমনি পবিত্র ব্রাহ্মণগৃহের ঋষি মুনির বংশধরের পুত্রের দেহমধ্যে সিদ্ধ মন্ত্র এক অপূর্ব রূপের বিকাশ করে। আবার যেমন, কেবল ভাল যন্ত্র হইলেই গান হয় না, সেই সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ভাল যান্ত্রিক থাকা চাই,—ভাল সুরজ্ঞ, চতুর বাজিয়ের হাতে সর্বোত্তম বীণা থাকলে সে যেমন অপূর্ব সঙ্গীতের বিকাশ করে, তেমনি ভাল ক্ষেত্র, ভাল দেহ, ভাল সাধক হইলেই হইবে না—বাজিয়ে ভাল চাই, গুরু ভাল চাই, তবে ত গান জমিবে, সাধনায় সিদ্ধি সদ্য সদ্য হইবে। মহাত্মা সিদ্ধ সাধক ত্রিপুরানন্দের মতন গুরু মিলিয়াছিল বলিয়াই সর্বানন্দ এক জীবনে সর্ববিদ্যা

লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সর্বানন্দ মূর্খ, দুরন্ত ছেলে; ব্রাহ্মণের ঘরের মূর্খ বলিয়া পিতামাতার পরিত্যক্ত—উপেক্ষিত। কিন্তু সর্বানন্দ অত্যুৎকৃষ্ট আধার, তাহার দেহ ব্রাহ্মণের দেহ, তাহার যন্ত্র উচ্চাঙ্গের। সঙ্গে সঙ্গে গুরুও মিলিল—ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। সর্বানন্দ এক জপের প্রভাবেই মাতৃদর্শন করিল, সর্ববিদ্যা লাভ করিল, স্বীয় বংশকে ধন্য করিয়া গেল। তাহার দেহ মধ্যে মহাতন্ত্রের ঝঙ্কার দণ্ডেক কাল হইতে না হইতেই সুর জমিয়া গেল, আত্মময় আকাশে harmony এবং melody দুইয়ের বিস্তার ঘটিল, সর্বানন্দের ভাগ্যে অপরূপের রূপদর্শন হইল। তেমন রূপের বিকাশ তোমার আমার চিত্তাকাশে হইবার নহে; কেন না, তুমি আমি সাধারণ বাজারের বেহালা, ষ্ট্রাড নহি, ত্রিপুরানন্দের মতন ওস্তাদ বাজিয়ে, বড় গুরু তোমার আমার ভাগ্যে জুটে নাই। তাই তন্ত্রে সাধারণ সাধকদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সিদ্ধ সাধকগণের তপঃসিদ্ধ মস্তিষ্ক প্রতিভাত যে রূপ, সেই রূপকে অবলম্বন করিয়া বীজমন্ত্র জপের সহিত ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যান প্রগাঢ় হইতে থাকিলে সিদ্ধ সাধ্য মূর্তি তোমার প্রকৃতির অনুকূল হইয়া ফুটিয়া উঠিবেন। তখন বুঝিতে হইবে, সাধক সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তন্ত্র এইটুকু জাতিভেদ মানিয়া থাকেন; দেহের যোগ্যতা বিচার করিবার কালে, কোন দেহ কেমন মন্ত্রের উপযোগী, তাহা নির্দেশ করিবার কালে তন্ত্র জাতিবিচার এবং জন্মকোষ্ঠী মান্য করেন।

তন্ত্রের এই রূপতত্ত্ব অপূর্ব ব্যাপার; শব্দবিজ্ঞানের বহু সিদ্ধান্ত এই রূপবিকাশের ব্যাখ্যায় তন্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন। তন্ত্র স্পর্ধা করিয়া বলিতেছেন যে, আমার নির্দেশমত সদ্‌গুরুর সাহায্যে সাধনা করিয়া দেখ; দেখিবে—সদ্য সদ্য ফল পাইবে, অরূপিণীর রূপের আলোয় তোমার প্রাণ মন ভরিয়া উঠিবে। তাই তন্ত্র বলেন যে, যদি রূপ দেখিতে চাও, রূপসাগরে ডুবিতে চাও, তাহা হইলে মানস পূজা—অন্তর্জপ করিতে থাক। ভূতশুদ্ধিতে আছে—

> "সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।
> অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ ॥"

যামল গ্রন্থেও লিখিত আছে,—

> "পূজাভাবেৎমহেশানি হৃদয়ে পূজয়েচ্ছিবাং।
> সর্বপূজাফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ঃ ॥"

আমাদের দেশে একটা রীতি প্রচলিত আছে যে, সিদ্ধ সাধকগণ জপ-যজ্ঞের ফলে যে ধ্যানগম্য মূর্তি দর্শন করিয়া থাকেন, যাহার মানস পূজা করিয়া কৃতার্থ হন, স্তব স্তোত্রের ইশারায় তাঁহারা সেই রূপের বর্ণনা লোকসাধারণের শ্রবণগোচর করিয়া দেন। সাধারণ পূজাকে সাধকের মুখ-নিঃসৃত স্তব শুনিয়া একটা রূপের, একটা প্রতিমার কল্পনা করিয়া লয়, এবং ধাতু, পাষাণ বা মাটির মূর্তি গড়িয়া তাহারই প্রকাশ্যে পূজা অর্চনা করে। লোকহিতের জন্য, সমাজে একটা ভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালায় মূর্তিপূজার প্রচলন হইয়াছে। এখন যে সিংহবাহিনী দশভূজা দুর্গার প্রতিমা গড়িয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি, শত বর্ষ পূর্বে ঠিক এমন ভাবের প্রতিমা বাঙ্গালার কারিগর গড়িত না। গোড়ায় যখন সিংহবাহিনীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা এ দেশে প্রচলিত হয়, তখন কার্তিক গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী, কেহই ছিলেন না, তখন একা সিংহবাহিনী মহিষাসুর মথন করিতেছেন। সেকালের সিংহের চেহারা আর এক রকমের ছিল, মহিষাসুরও আজকালকার চোরা অসুরের মতন ছিল না। যাহার যেমন অভিরুচি হইয়াছে, যেমন শখ হইয়াছে, ধ্যানে যে যখন নূতন কিছু দেখিতে পাইয়াছে, তখন সে তাহাই প্রতিমার সঙ্গে বসাইয়া দিয়াছে। কারণ, আসল কথা এই যে, দুর্গোৎসবের সময়ে যে প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে উৎসব করিয়া থাকি, সে উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পূজা হয় না; পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণ ঘটের, দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে; কেন না ঘট ঐখানে পূজকের দেহঘটের অনুকল্প মাত্র। প্রতিমা বাহ্য শোভার জন্য রাখা হয় এবং লোকসাধারণের তুষ্টির জন্য উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্য একটু পূজা করা হয়। কালীপূজাতেও ঐ একই ব্যাপার ঘটে। পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী মুণ্ডমালিনী কালীকে আরাধনা করিতে হয় বর্ণে বর্ণে, চক্রে চক্রে; মন্ত্রের উপর হোম করিতে হয়, মন্ত্রের উপর কালিকাশক্তির আহ্বান করিতে হয়। বাহিরের মূর্তি অবলম্বন মাত্র, লোক দেখাইবার ছবি মাত্র। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, এখন যে কালীমূর্তি গড়িয়া আমরা পূজা করি, ঠিক ঐ ভাবের মূর্তিপূজা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই এই দেশে প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে মূর্তি গড়িয়া প্রতি অমাবস্যায় পূজা করিতেন এবং স্বয়ং তাহাকে মাথায় করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসিতেন। তাই নিয়ম আছে যে, কালীপূজা স্বয়ং করিতে হইবে, অথবা গুরুর দ্বারা করাইতে হইবে। অন্য

পুরোহিতের দ্বারা কালীপূজা করাইলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। আগমবাগীশের এই ব্যবস্থার পূর্বে বাঙ্গালায় কালীপূজা মন্ত্রে বা ঘটস্থাপনা করিয়া হইত, অথবা সিদ্ধ সাধকের পীঠস্থানে যাইয়া পূজা করিতে হইত। কোন কোন তন্ত্রে দেখিতে পাই যে, সর্বসুলক্ষণসম্পন্না শ্যামা কুমারীকে আনিয়া, তাহাকেই কালী বলিয়া পূজা করা হইত। এ ক্ষেত্রে মিডিয়মের (medium) হিসাবে কালীপূজা হইত। মাটি খুঁড়িয়া যত পাষাণ-প্রতিমা বাহির হইতেছে, তাহার মধ্যে আধুনিক হিসাবের কালীমূর্তি একটাও পাওয়া যায় নাই। সিংহবাহিনী বা কমলা জগদ্ধাত্রীর মূর্তিরও বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে।

রূপের কথায় তন্ত্র আর একটা নূতন কথা কহিয়াছেন। তন্ত্র বলেন, আমাদের দেহস্থ ছয়টা চক্রে ছয়টা মাতৃমূর্তি ফুটিয়া উঠে। বৌদ্ধ তন্ত্রে ইহাদিগকে ছয়টা শূন্য বলে। এই ছয় শূন্য কুণ্ডলীর সাহায্যে ভেদ করিবার সময়ে ছয়টা রূপের বিকাশ হয়; তাহার পর চিত্রার পথে যাইলে আরও আটটা শূন্যে বা চক্রে আরও আটটা রূপের বিকাশ হয়; শেষে রূপ অরূপে মিশাইয়া যায়।

> "ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
> বিসতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীং।
> অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে।
> ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষান্মনন্ত্রয়ো ভবেৎ॥"

এই ভুজঙ্গরূপিণী দেবীকে ষট্‌চক্রে ষট্ শিবার সাহায্যে অর্থাৎ ষট্‌চক্রের অধিষ্ঠাত্রী ষট্ শক্তির সাহায্যে ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়। এই ষট্ শিবার নাম—ডাকিনী, রাকিনী, শাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী। ইহাদেরই প্রভাবে বীজমন্ত্রের ঝঙ্কারে এবং ষট্‌চক্রভেদের সাধনার প্রভাবে এক একটি রূপ ফুটিয়া উঠে।

> "ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেবস্বরূপিণীম্।
> সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং।
> নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাং।
> পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং সদা চঞ্চললোচনাম্॥"

এই ভাবে তন্ত্র স্তরে স্তরে রূপের বিকাশ ঘটাইয়াছেন। দেহের মধ্যে যত শক্তি আছে, সকলেরই একটা মূর্তি আছে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে। দেহের যত ক্রিয়া, যত শক্তির অভিব্যঞ্জনা, সবই আদ্যা শক্তির সাহায্যে হইয়া থাকে।

যেমন দেহভাণ্ডে, তেমনই বিশ্বভাণ্ডে শক্তির এবং রূপের বিকাশ হইয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তির, সকল ক্রিয়ার অন্তরালে ঐ কুণ্ডলী শক্তি এক এক রূপে বিরাজ করিতেছেন। যাঁহারা সিদ্ধ সাধক, তাঁহারা দেহভাণ্ডে রূপের বিকাশ করিয়া, সেই রূপকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তৎসম ক্রিয়ার উপর ফুটাইতে পারেন। সাধকের ভাগ্য ভাল হইলে, সিদ্ধ পুরুষের কৃপায় নদীর জলে সে জলদেবীকে—মকরবাহিনী গঙ্গাকে দেখিতে পাইবে, পর্বতে পার্বতীর ছায়ারূপ তাহার নয়নগোচর হইবে। দেহের সর্বাঙ্গে যেমন বিসতন্তুময়ী, সাক্ষাৎ অমৃতরূপিণী দেবী নানারূপে বিরাজ করিতেছেন, তেমনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বাঙ্গে, সর্বব্যাপারে বিসতন্তুময়ী দেবী বিরাজ করিতেছেন। তিনি না থাকিলে কিছু থাকে না, কিছু দেখা যায় না, কোন পদার্থ অনুভূতিগম্য হয় না। তিনি ভিতরে এবং বাহিরে থাকিয়া কেবল দেখাদেখি করিতেছেন, নিজেকেই নিজে দেখিতেছেন এবং নিজে দেখাইতেছেন। তন্ত্রের রূপতত্ত্ব বড়ই কঠিন, বড়ই দুরধিগম্য বিষয়। যে সাধক নহে, সে উহা বুঝিতে পারে না। অথচ এই রূপতত্ত্বের উপরই মূর্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত। মহানির্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥"

অর্থাৎ নিরাকারা কালজননী মহাদ্যুতি কালিকার গুণক্রিয়ার অনুসারে রূপ কল্পনা করা হয়। গুণ বলিলে বুঝিবে—সাধকের দেহের প্রকৃতি, কালের প্রভাব, দেশের প্রভাব, এবং ক্রিয়া বলিলে বুঝিতে হইবে—বীজমন্ত্রপ্রভাব এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে সাধনপদ্ধতি। এইটুকু বলিয়া মহানির্বাণ তন্ত্র কালীর যে ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালীমূর্তি হইতে অনেক পৃথক্। এ কালী রক্তাম্বরপরিধানা, উলঙ্গিনী নহেন: এ কালীর যুগলপাণি, এক হাতে অভয়, আর এক হস্তে বর দান করিতেছেন এবং সুমধুর মাধ্বীক অর্থাৎ মধুপুষ্পজাত মদ্যপানানন্তর নৃত্যপরায়ণ মহাকালকে সম্মুখে দর্শন করিয়া যাঁহার বদনকমল প্রফুল্ল হইয়াছে। এই কালীকে মায়ারাহিত্য, মোহরাহিত্য, লোভরাহিত্য, দম্ভরাহিত্য প্রভৃতি এবং অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি পঞ্চদশ ভাবরূপ পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে।

এইবার ভাবের কথা আসিল। এই দ্বিতীয় থিওরি বা সিদ্ধান্ত ভক্তিশাস্ত্রের পথ দিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের দেহে একাদশটা আসক্তি আছে,

তাহাদের ইংরেজীতে emotions বলিলে কতকটা বুঝা যায়। এই আসক্তির সাহায্যে উপাসনা করিতে হয়। যাহার যে আসক্তি প্রবল, সে সেই আসক্তির অনুরূপ দেবতার রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। এ কথাটা আমি গত বৎসরে 'প্রবাহিণী'র পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। এই ভাবের উপাসনায় বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক একমত,—সিদ্ধান্ত বিষয়ে কেহ কাহারও বিরোধী নহে। এ সম্বন্ধে পরে প্রয়োজন হইলে বলিতে পারি। মনে রাখা ভাল যে, তন্ত্র এবং উপনিষদের কথা ধরিয়াই পুরাণের সৃষ্টি। সিদ্ধান্তশাস্ত্র বলিতে গেলে তন্ত্র এবং উপনিষদ্‌ই বুঝায়; এই দুই সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বেদীর উপর পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু তন্ত্রের মন্ত্রাংশের একটা সিদ্ধান্ত ধরিয়া এত কথা বলিতে হইল। ভাবের ও ভক্তির আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধান্তরে পরে করিব।

২

যখন কোন পুরাতন ধর্মে, আচারপদ্ধতিতে বিকৃতি বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে, তখনই সেই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদস্বরূপ একটা নূতন ধর্মের উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম, মুখ্যভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবাদ। মানুষ ছাড়া, মনুষ্যের আত্মা ছাড়া যে একটা স্বতন্ত্র ধাতা, পাতা, স্রষ্টা পরমেশ্বর আছেন, ইহাই বুঝাইবার জন্য খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব। বৌদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদ বা agnosticism এর প্রতিবাদ খ্রীষ্টান ঈশ্বরবাদ বা Theism। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রথম উদ্ভবকালে মূর্তি বা প্রতীকপূজার তেমন তীব্র বিরোধ ঘটান হয় নাই। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ অনেকটা পৌত্তলিক, ইসলাম ধর্ম এই পৌত্তলিকতার ঘোর প্রতিবাদ। আরবে ইসলাম ধর্ম উদ্ভবের পূর্বে বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্মের প্রাবল্য ছিল। হূণ ও তাতারগণ বৌদ্ধ ছিলেন; পারসীক ও ইরানীগণ অগ্নিপূজক ও তান্ত্রিক ছিলেন। ইসলাম ধর্ম এই বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্মের প্রতিবাদস্বরূপ। মুসলমানের মসজিদে কোন ছবি বা কাহারও প্রতিমূর্তি শোভার্থেও রাখিতে নাই, গৃহশোভার হিসাবেও পক্ষী বা মৃগ বা ফল ফুলের আলেখ্য অঙ্কিত করিতে নাই। মোসলেম ধর্মের মতন পৌত্তলিকতার এমন ভীষণ প্রতিবাদ জগতে পূর্বে আর কখনও হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায়

না। আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যেখানে মোসলেম গিয়াছে, সেইখানেই মূর্তি বা দেবপ্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে, দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার উপর মসজিদ গড়িয়াছে।

এই খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের উদ্ভবে জগতের ভাবরাজ্যে একটা ওলট্‌পালট্‌ ঘটিয়াছে। উপনিষদে, দেবীসূক্তে যেমন আমিই সব, আমা হইতে সব—এই তত্ত্বের উপর মন্ত্রধর্ম সৃষ্ট হইয়াছিল, খ্রীষ্টানের ঈশ্বরবাদে তাহা চাপা পড়িয়া যায়। আমা হইতে প্রবলতর, প্রবীণতর একটা শক্তি আছে, তিনি ইচ্ছাময়, শক্তিময়, কৃপাময় মহাপুরুষ—তিনিই ঈশ্বর। জীব, মানুষ এই ঈশ্বরের কিঙ্কর, সেবক, দাসানুদাস; ঈশ্বর সকলের প্রভু, বিভু ও সর্বব্যাপী। এই ভাবটা প্রবল হইয়া উঠিল। এই ভাব হইতেই রামানুজাচার্যের কৈঙ্কর্যবাদ ও সেবাপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, রামানুজাচার্যের কাল হইতে শ্রীচৈতন্য কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের তলায় প্রচ্ছন্নভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের সিদ্ধান্তসকল লুকান আছে। তাঁহারা বলেন যে, শঙ্করাচার্য পর্যন্ত তন্ত্র ও উপনিষদের আত্মপ্রধান অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ধর্ম ভারতবর্ষে প্রবল ছিল। তাহার পর যত বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, সে সবই খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মের সিদ্ধান্তসকলের সহিত আপোস মাত্র। যেখানে আত্মা ছাড়া অন্য একটা ঈশ্বরের উপকল্পনা হইয়াছে, সেইখানেই বৈদেশিক প্রভাব বিরাজ করিতেছে বুঝিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভাবময় দেবমূর্তির পরিকল্পনা এন্টিওকের আর্মিনিয়ান খ্রীষ্টান বুদ্ধগণের সিদ্ধান্তের ছায়া মাত্র। এ কথাটা সত্য কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সঙ্গে যে খ্রীষ্টান ও মোসলেম ধর্মসিদ্ধান্তের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। এ সাদৃশ্য কোথা হইতে আসিল, কেন হইল, তাহা এখনও কেহ খুলিয়া দেখাইতে পারে নাই। তবে উহা যে, তন্ত্রসিদ্ধান্তের অনেকটা বিরোধী, তাহা আমাদের মনে হয়।

তন্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মাই আমাদের উপাস্য। তোমার ইষ্টদেবতা ও তোমার আত্মা এক এবং অভিন্ন পদার্থ। তুমি যাহা খাও, যাহা ব্যবহার কর, তাহাই তুমি তোমার ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। তুমি মাংসাশী হইলে তোমার ইষ্টদেবতাকে মাংস নিবেদন করিয়া দিবে। তোমার

পক্ষে যাহা ভাল, তোমার ইষ্টদেবতার পক্ষে তাহাই ভাল। মহানির্বাণ তন্ত্রে এই কথাটা অতি স্পষ্টভাবে লেখা হইয়াছে।

'সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈব'ত।
যদাত্মনি প্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ॥"

অর্থাৎ দেবতা বিষয়ে দেয় বস্তুতে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী। যে যে বস্তু আপনার প্রিয়, তাহাই ইষ্টদেবতাকে দিবে। যে সুরাপায়ী, সে শোধন করিয়া, দেবতার প্রসাদ করিয়া, তবে সুরা পান করিবে। মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী, শশক গোধা, কূর্ম ও গণ্ডার, এই দশবিধ পশু বলিদানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধকের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য পশুও বলি প্রদান করিবে। কেবল নরমাংস ও নরাকার পশুর মাংস ভোজন করিবে না; গো অতিশয় উপকারক জীব, তাই গোমাংস ভক্ষণ করিবে না। তবে বৃহৎতন্ত্রসারে আগমবাগীশ বলিয়াছেন যে, গোমাংস মহামাংস; ভৈরবীচক্রে গোমাংসভোজী সাধক বসিলে উহা দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে। এ কুলধর্ম কেমন? মহানির্বাণ তন্ত্র উত্তর করিতেছেন—

"অশুচির্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাদ্যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খসাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্ বিনা কোঽন্যমর্চয়েৎ॥"

অর্থাৎ এই কুলযোগী ও কুলধর্মের স্পর্শে অশুচি শুচি হয়, অস্পৃশ্য স্পৃশ্য হয়, অভক্ষ্য ভক্ষ্য হয়, অব্যবহার্য ব্যবহার্য হয়। কিরাত, পাপী, ক্রূর, পুলিন্দ, যবন, খস, কুলযোগীর ও কুলধর্মের স্পর্শে পবিত্র হয়। কারণ, কুলধর্ম আত্মার ধর্ম, কুলযোগী আত্মদর্শী পুরুষ। যত জীব, তত শিব; যত নারী, তত শক্তি; সুতরাং ভিতরের ব্যাপারে সকল দেশের নর নারীই সমান; কেবল যোগ্যতার হিসাবে ছোট বড়র বিচার হইয়া থাকে। তন্ত্র, দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পদার্থ বলিয়া মনে করেন না। তন্ত্র বলেন, ভাষায় তেমনি করিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু এক বার সাধনা করিয়া দেখ দেখি, আত্মার আস্বাদন পাইলে কি অপূর্ব আনন্দ অনুভূত হয়। যে বুঝিয়াছে, সে-ই মজিয়াছে। তাই তন্ত্র বলেন—'যৎ যৎ শাস্ত্রমধীতব্যং তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ' —যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহার অনুকূল ব্রতাচরণ করিতে হইবে। কারণ, ব্রতাচরণ না করিলে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ঠিকমত বুঝা যায় না। এই তন্ত্রতত্ত্ব মূর্তিও

বুঝে না, অমূর্তও কিছু মানে না ; তন্ত্র বলেন,—আত্মার সাগরে কি আছে, কে জানে ? এক বার ডুব দিয়া দেখ না, এক বার অকূল পাথারে গা ভাসাইয়া দেখ না। যদি মূর্তি না পাইলে তোমার সাধ না মিটে তবে মূর্তিপূজা করিও ; যদি উপাসনা করিলে, মন্ত্র জপ করিলে সাধ মিটে, তবে তাহাই করিও। আত্মাই ইষ্ট, আত্মাই পূজ্য, আত্মাই সব।

এই অতিপুরাতন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ হইল খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম এবং ভারতবর্ষের আধুনিক আচার্যগণ-ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মসকল। এই সকল ধর্ম জীব ও শিবকে নিত্য পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এই জীব ও শিবে নিত্য-পার্থক্য তন্ত্র মানেন না। তন্ত্র বলেন,—যেমন সকল দেশের, সকল জাতির শিশু আকারে ও প্রকৃতিতে প্রায় একই রকমের, শিশুর খেলায়, শিশুর ব্যবহারে যেমন শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের ভেদ থাকে না ;—যেমন মরণ ব্যাপারটা সকল জীবের পক্ষে সমান, মরিবে সবাই, মরণভয় সকলেরই আছে, মরণপদ্ধতি সকল জীবের পক্ষে সমান, তেমনই আত্মা গোড়ায় সব এক, অভিন্ন ও একপ্রকৃতিক। পরমাত্মায় ও দেহাবচ্ছিন্ন আত্মায় কোন ভেদ নাই ; যে ভেদ দেখিতে পাও, তাহাই মায়া মাত্র—মিথ্যা মাত্র। এই মায়ার জাল ছেদ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। গীতায়, দেবীপুরাণে এবং অন্য তন্ত্রগ্রন্থে (নিগমগ্রন্থে) এই একই সিদ্ধান্তবাচক শ্লোক অবিকৃত ভাবে আছে,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

এই মায়াজন্যই তুমি আমি ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মায়া কাটাইতে হইলে তোমার আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়া প্রয়োজন। তুমি আমাকে চিনিলে (তোমাকে চিনিলে) সব এক বলিয়া জানিতে পারিবে—আমাময় হইতে পারিবে। এখন জিজ্ঞাস্য—এই মায়া ছেদ করি কেমন করিয়া ? উত্তরে তন্ত্র বলিতেছেন,—'বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং'—বিনা উপাসনায় মনুষ্য কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। সে উপাসনা কি ও কেমন ? এক আত্ম-আরাধনা, দ্বিতীয় পূজা, পাঠ, স্তুতি, গীতি, এবং রসাশ্রিত ভাবের উপাসনা। আত্ম আরাধনার কথা সংক্ষেপে পূর্ব পূর্ব সন্দর্ভে বলিয়াছি। সে আরাধনার মধ্যে কাম ও মদনতত্ত্ব, সেই রাধনার মধ্যে নাম ও রূপতত্ত্ব, সে আরাধনার মধ্যে জপযজ্ঞ ও শক্তিসাধনা —ষট্চক্রভেদ, শবসাধনা প্রভৃতি। পূজা, পাঠ, স্তব, স্তুতির মধ্যে খাঁটি

মূর্তিপূজা—প্রবৃত্তিমূলক পূজা ও শেষে নিষ্কাম উপাসনা আছে। এই উপাসনায় ঈশ্বরের অসংখ্য মূর্তি, অগণ্য প্রতিমা আছে; এই উপাসনায় দেশভেদে, জাতিভেদে নানা পদ্ধতি নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তন্ত্র উপাসনাপদ্ধতির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। তবে যে সকল তন্ত্রে কেবল পূজোপাসনার পদ্ধতি বর্ণিত আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাতে দ্বৈতবাদের, জীব-শিবের ভেদজ্ঞানের বিচারও আছে। বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, যে তন্ত্রে দ্বৈতবাদের আলোচনা আছে, তাহা বেজায় আধুনিক। সে সকল তন্ত্রগ্রন্থ সম্প্রদায়গত পুস্তক মাত্র, সকল উপাসক সম্প্রদায়কে আবেষ্টন করিবার উদ্দেশ্যেই সে সকল তন্ত্র লিখিত হইয়াছিল। তন্ত্রের আধুনিক সংকলন কর্তারাও কিন্তু দ্বৈতবাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মানন্দ গিরি, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি তন্ত্রসংগ্রাহকগণও অদ্বৈতবাদের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তন্ত্র কিন্তু দ্বৈতভাবে পূজা করিতে বাধা দেন না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—যাহার যেমন ভাবনা, যেমন রুচি, তাহার তেমনই ভাবে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহাই তন্ত্রের অনুশাসন। তন্ত্রের যেখানে যত দেবদেবীর পূজাপদ্ধতির উল্লেখ আছে, সেইখানেই স্তবের আবরণে অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তসকল বেমালুম চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। গণেশ, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, সূর্য্য—যাঁহার স্তব পাঠ করিবে, তাঁহাকেই সর্বময় ও অদ্বৈততত্ত্বের আধারস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—সকলেই সর্বদেবময়, সর্বভাবময়, সর্বরূপময়, সর্বসাক্ষী ও সনাতন। সাধারণ পাঠকে বলিয়া থাকেন যে, পুরাণ তন্ত্রের বড় মজা, যখন যে দেবতার পূজা করে, তখনই তাহাকে সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া তোলে। আসল কথা—সবাই এক, এক পরমাত্মার, এক আত্মার বিভিন্ন পাত্রানুসারে, ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যঞ্জনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এক পরমাত্মাই আছেন, আর সব তাঁহার উপর সাধকের আরোপিত ভাবের ছায়া মাত্র। সাধকের কল্পনা ছাড়া তাহাদের অন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যখন যে ভাবের উপাসনা করিতে হয়, তখন সেই ভাবকে বাড়াইয়া তুলিতে হয়, তবেই ভাবসামরস্য ঘটিয়া থাকে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে; পুত্র মায়ের কোলে শুইয়া মায়ের মুখ যেমন দেখে, এমন মিষ্ট ও মধুর আর কিছু দেখে না; প্রণয়ী যুবক প্রণয়িনীকে যত সুন্দরী ও মাধুর্য্যময়ী দেখে, এত আর কিছুই দেখে না। যেখানেই ভাব, সেখানেই আসক্তির কেন্দ্র, সেইখানেই

ভাবুকের সর্বাপেক্ষা মধুর ও সুন্দর বোধ হয়—সে তেমন আর দেখে নাই, তেমন আর দেখিবে না। তেমনই ভাবের দেবতা প্রকৃত ভাবুকের কাছে, রসিক প্রেমিকের কাছে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, মনোহর, শক্তিশালী ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাবের দিকের এই গুপ্ত তত্ত্বটুকু লইয়া, তাহার সহিত অদ্বৈত সিদ্ধান্ত জড়াইয়া আমাদের স্তবস্তোত্রসকল রচিত হইয়াছে। তাই যখন যে দেবতার কথা পুরাণে বা তন্ত্রে লেখা থাকে, তখন তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা বড়, সুন্দর ও মনোহর বলিয়া পরিচিত করা হয়। কালীর স্তব করিতে যাইয়া মহানির্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন,—

"ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ীতনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনুঃ॥

এই নমুনা হইতে বুঝা যায়—আমাদের তান্ত্রিকী উপাসনা তত্ত্বতঃ কেমন। চণ্ডী, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ ও শক্তিধর্ম-প্রচারক যে পুরাণ, যে তন্ত্র পাঠ কর না কেন, সর্বত্র এই ভাবের কথাই পাইবে। আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মচিন্তা সকল উপাসনার, সকল মূর্তিপূজার অন্তরালে আছে। দ্বৈতবাদীরা বলেন বটে যে, জীব ও শিব কখনই এক হইবে না, সাধক অনন্তকাল সেবা করিবে; কিন্তু এ কথাটা নিত্য-রসাস্বাদনের লোভেই বলা হইয়াছে। চিনি খাইব, চিনি হইতে পারিব না—ইহা মধুররসলম্পট সাধকদিগের কথা। সে রসের কথা পরে বলিব।

শিব ও শক্তি

পূর্বে এই 'প্রবাহিণী'তেই আমি শিবতত্ত্বের সামান্য একটু ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। তন্ত্র, শিবকে সৃষ্টির সার সত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শিব অধিকারী, অবিনশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, অচল ও সনাতন; ইনি আছেন বলিয়া সৃষ্টি আছে; ইনি অনাদি, অনন্তকালস্থায়ী, ইঁহাতে জড়িতা সৃষ্টি-শক্তিও

অনাদি ও অনন্তকালব্যাপিনী। যেমন একটা বাঁশের খোঁটার উপর একটা অপরাজিতা বা মাধবী লতা জড়াইয়া দিলে, লতা যেমন পত্রপুষ্পে সেই বংশখণ্ডকে আবরণ করিয়া রাখে, বাহিরের লোকে বাঁশ দেখিতে পায় না, কেবল লতাপত্রের বেষ্টনে একটা দণ্ডাকার পুষ্পমালা দেখে, তেমনি সৃষ্টিশক্তি-বেষ্টিত—কুণ্ডলিনীবলয়িত শিবকে কেহই দেখিতে পায় না—কেবলই শক্তির বিকাশ দেখে, সৃষ্টির লীলাখেলা দেখে। যেমন বংশবেষ্টনে লতার উদ্দণ্ডবিকাশ ভিতরে বংশের বিদ্যমানতা হেতু হইয়া থাকে; বাঁশ না থাকিলে লতা ধুলায় লুটাইত, অথবা অমন গজাইত না, উহার শোভা দূর হইতে লোকে দেখিতে পাইত না; তেমনি সৃষ্টি-চাতুরীর অন্তরালে শিব আছেন বলিয়া—নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ অচলোঽয়ং সনাতনঃ—পুরুষ আছেন বলিয়া প্রকৃতির এত লীলাখেলা ফুটিয়া উঠিতেছে—সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। সৃষ্টির আবরণের ভিতরে তিনি আছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে পারা যায় না, জানিতে পারা যায় না বলিয়াই শিব কেবল লিঙ্গের দ্বারা—চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। শিবের নমস্কারের মন্ত্রে আছে,—

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ হে মহাদেব, তোমার তত্ত্ব জানি না; তুমি কেমন, তাহাও ত জানি না; তুমি যেমনই হও না, তুমি যাহাই হও না, আমি তেমনকে, তাহাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। সে শিব, সে তেমন, সে তাহা কেমন?

"ধরাপোঽগ্নিমরুদ্ব্যোমমখেশেন্দ্বর্কমূর্তয়ে।
সর্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ॥
শ্রুত্যন্তঃকৃতবাসায় শ্রুতিরূপাখিলাত্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ॥
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দেশ্যায় সম্ভবে।
ভবায় ভবভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তু তে॥"

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজ্ঞ, ঈশান, চন্দ্র ও সূর্য্যমূর্তির অন্তরালে তুমি প্রকট রহিয়াছ, সর্বভূতের অন্তরে অন্তরাত্মাস্বরূপে তুমি বিরাজমান; হে শঙ্কর! তোমাকে নমস্কার। তুমি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য, শ্রুতিস্বরূপ, তুমি নানা মূর্তিতে কীর্তিত হইয়া থাক, তুমি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, অথচ প্রকাশস্বরূপ, সেই নিত্য শঙ্কর দেব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যাঁহাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম বলিয়া

নির্দেশ করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ যিনি স্থূল সূক্ষ্মের অতীত, যিনি ভব বা সৃষ্টির সত্তাস্বরূপ, যি'ন বা যাঁহা হইতে সৃষ্টি বা ভব উৎপন্ন হইয়াছে, তেমন দুঃখহারী শঙ্করকে নমস্কার। এই সকল স্তব স্তোত্র হইতে বুঝা যায় যে, শিব অস্তিত্ব-জ্ঞাপক মাত্র। এই যে আছে—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আছে, জন্ম জরা মরণ আছে, পরিবর্তন পরিবর্ধন সংহরণ আছে, ইহা শিবের অস্তিত্বের জন্যই থাকে ও আছে। আমি আছি—বাল্যে যেমন ছিলাম, যৌবনে যেমন ছিলাম, প্রৌঢ়ে যেমন ছিলাম, এখন বার্ধক্যে যেমন আছি, সে এক আমিই আছি: এই যে অস্তিত্বের একটা অপরিবর্তনীয় বোধ,—ইহা আমাতে শিব আছেন বলিয়াই আছে,—সৃষ্টির সকল লীলার অন্তরালে শিব থাকেন বলিয়াই এই বোধটা—এই অস্তিত্বের জ্ঞানটা থাকে। অহমস্মি—এই জ্ঞানই শিবজ্ঞান, আমার নয়নের উপর বিশ্ব বিকশিত হইয়া আছে—ইহাও শিবজ্ঞান। শিব—জগতের অস্তিত্বস্বরূপ—অখণ্ড দণ্ডায়মান কালস্বরূপ, সনাতন স্থাণুর স্বরূপ। তাই শিবের নাম শুব, সর্ব, মৃড়, হর প্রভৃতি।

'শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাৎ'—ষট্‌চক্র বর্ণনায় তন্ত্র বার বার বলিয়াছেন যে—শিব শূন্যময়; শূন্যাকার, শব্দময়, ওঁকাররূপী,—সুতরাং শিব স্বয়ম্ভু লিঙ্গ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু চিহ্নস্বরূপ। মানুষের দেহের ছয়টা চক্রে শিবজ্ঞান বা জ্ঞানময় শিবরূপ ছয় ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। আর কুণ্ডলী শক্তি 'সর্পাকারা শিবং বেষ্ট্য সর্বদা তত্র সংস্থিতা' অথবা যিনি 'সার্ধ-ত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎসমপ্রভা' অর্থাৎ তিনি শিবের চারি দিকে সাড়ে তিনটা পাক খাইয়া কোটি বিদ্যুতের প্রভা বিকিরণ করিয়া আছেন। 'শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাদিন্দুংপরমকুণ্ডলীং' অর্থাৎ শূন্যরূপ শিবের চারিদিকে চন্দ্রজ্যোতিঃসম্পন্না কুণ্ডলী বিরাজ করিতেছেন। ইহাই শিব শক্তি, ইহাই অবিভাজ্য, নিত্য এবং গুণত্রয়সমন্বিত, এই শিব-শক্তিতে ত্রিগুণ বিরাজ করিতেছে; কেবল শিবে কোন গুণ নাই। কারণ, শক্তির সাহায্যেই গুণের বিকাশ হয়; শক্তিশূন্য শিব চিন্তার ও কল্পনার অতীত। মনুষ্য ও জীবদেহে শিবশক্তি সমন্বিত হইয়া যুগলে বিরাজ করিতেছেন। কেবল জীবদেহে কেন বলি—সৃষ্টির সর্বস্বে, সর্বব্যাপারে, স্থূলে সূক্ষ্মে, স্থাবর জঙ্গমে, অণু পরমাণুতে শিব শক্তিযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শিব শক্তিশূন্য বা শক্তিবর্জিত হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না, তবে তাঁহাতে শক্তি কখনও সম্মূঢ়াবস্থায় বিরাজ করেন, কখনও প্রকট ভাবে বিদ্যমান থাকেন। যখন শক্তি সম্মূঢ়, তখন তিনি বিন্দুরূপিণী—বিন্দুবাসিনী, সে বিন্দু শিবের মধ্যেই সংন্যস্ত।

যখন শক্তি প্রকট, তখন তাঁহার নানা রূপ, নানা বিভাব, নানা বিকাশ। কিন্তু তাহাতেও তন্ত্র বলিতেছেন,—

"ভুজঙ্গরূপিণীং দেবী নিত্যানং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
বিসতন্তুময়ীঃ দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্॥
অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে।
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়োভবেৎ॥"

এই পরা শক্তি কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গরূপিণী, পদ্মনালের সূত্রের মতন অতি সূক্ষ্ম, অতি মধুময়ী, তিনি অব্যক্তরূপিণী, দিব্যরূপা এবং ধ্যানগম্যা তাঁহাকে ধ্যান করিলে, জপ করিলে সাধক ব্রহ্মময় হইতে পারে। মায়ের রূপ যাহা, তাহার আলোচনা 'তন্ত্রে মূর্তিপূজা' শীর্ষক সন্দর্ভে কতকটা করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং সে ভাবের—রূপের কথা এখন আর বলিব না। শক্তির হিসাবে মা—জগন্ময়ী—

'যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥'

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সদসৎ যাহা কিছু আছে, তাহাদের অন্তর্গত যে শক্তি আছে, সে তুমিই; অতএব তোমার আর স্তব করিব কি! কারণ আমিই যে তুমি—

'অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।'

আমার মধ্যে যে সকল শক্তি বিরাজ করিতেছে, সে যে তুমি; তোমার জন্যই জীবন, তোমার জন্যই দেহ, তোমার জ ই বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, ধৃতি—তুমিই আমার সব। অতএব তোমার আবার স্তব স্তুতি কি!

এই শিব শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্টির বিকাশ। এই শিব শক্তির ক্রিয়া বুঝিয়া এক আমি বহু এই কামনার প্রকাশ করাতেই সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। কাম ও মদন তত্ত্ব পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। মদন না থাকিলে সৃষ্টি হয় না, মদনের প্রভাবেই এক অপরকে আকর্ষণ করিতেছে, প্রত্যাখ্যান করিতেছে, আবার সম্মিলিত হইতেছে। এই মিলন ও বিয়োগের ফলে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের প্রভাবে একে দুই, এবং দুই হইতে বহুর বিকাশ হইতেছে। এই তত্ত্বটা মদনভস্ম এবং কুমারসম্ভবের অর্থবাদের সাহায্যে তন্ত্র বড় মিষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন। সে কথার পরে প্রয়োজন হইলে ব্যাখ্যা করিব। এখন শিবত্বের কথাটা আর একটু ফুটাইয়া বলিতে হইবে। তন্ত্রের হিসাবে শিব কেবল সংহারমূর্তিই নহেন, তিনি সৃষ্টিস্থিতির বিধানকর্তাও বটেন। যাহাতে

সকল পদার্থের সংহৃতি বা সঞ্চয় হয়, তিনিই রুদ্র বা শিব। শিবের চারি দিকেই সৃষ্টিশক্তির বিকাশ, শিবত্বেই সেই শক্তির নিলয় বা সেই শক্তি সম্পুটিত হয়; অতএব পদার্থের পরিণতি যাহা, তাহাই শিবে যাইয়া সঞ্চিত হয়। তাই পুরাণের ভাষায় কবির অলঙ্কারে শিব শ্মশানবাসী, চিতাভস্ম মাখিয়া আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আছেন। তিনি শূন্যময়; তাই রজতগিরিনিভং —শ্বেতকায়, তন্ত্রে শূন্যের শ্বেত বর্ণ। তিনি মৃত্যুঞ্জয়—জরা-মরণ-বিষ কণ্ঠস্থ। এইখানে তন্ত্রের একটা theory কথা বলিব। তন্ত্র বলেন যে, হিংসাই জীবনের অবলম্বন; প্রবল দুর্বলকে হিংসা করে—দুর্বলকে উদরস্থ করিয়া স্বীয় বল রক্ষা করে। সৃষ্টির সর্বস্বে ও সর্বব্যাপারে হিংসাই বিদ্যমান, যাহার হিংসা যত প্রবল, সে তত দিন অধিক বাঁচিয়া থাকে, তাহার বল তত অধিক হয়। এই হিংসাশক্তি যে দিন কমিয়া যায়, সেই দিনই জীব পঞ্চত্ব লাভ করে। তন্ত্র বলেন, সকল পদার্থের, সকল জীবের জীবন আছে, সর্বস্বে জীবনরূপিণী শক্তি বিরাজ করিতেছে। তুমি নিরামিষাশী বৈষ্ণব হইয়া শাক পাতা খাও, ঘৃত দুগ্ধ খাও, তাহাতেও প্রবল হিংসা আছে। কারণ, বৃক্ষ লতা পাতা, ফল মূল, এ সকলই সজীব প্রাণময় পদার্থ; ইহাদের মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছে। গাছের ফল যদি আপনি পাকিয়া পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এক কথা, কিন্তু বৃক্ষশাখা হইতে ফল ছিঁড়িয়া লইয়া তাহা ভোজন করিলে যেমন হিংসা হয়, মাছ ধরিয়া খাইলেও তেমনি হিংসা হয়। মূল ও কন্দ খাইবার জন্য গাছটাকে উপাড়িয়া তুলিয়া খাইলে যে হিংসা হয়, ছাগমাংস খাইলেও সেই হিংসা হয়। সর্বাপেক্ষা বড় হিংসা—বৎসকে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিয়া গাভীর দুগ্ধ চতুরতার সহিত দোহন করিয়া লইয়া পান করিলে কেবল হিংসাই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে নির্দয়তা ও কপটতার প্রকাশ পায়। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃক্ষ লতা গুল্মাদির, উদ্ভিদ জীব মাত্রেরই বেদনা-বোধ আছে—অনুভূতি আছে; অন্য জীবের যেমন সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে, যেমন বেদনাবোধ হয়, ঠিক তেমনই আছে। গাছের পাতা ছিঁড়িলে, ফুল তুলিলে বৃক্ষ ব্যথা পায়, রোদন করে। এই কথাটা—এই তত্ত্বটা তন্ত্র বহু পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন। তন্ত্রের যুক্তি এই যে, উদ্ভিদ যখন দেহী, তখন দেহীর সকল গুণ তাহাতে আছে; তবে উদ্ভিদের শব্দ বা বাক্‌শক্তি নাই, তাই বেদনা পাইলে বৃক্ষ লতা পাতা চীৎকার করিয়া রোদন করে না, ব্যথা জানায় না; পরন্তু ব্যথাবোধের জন্য ঠিক জঙ্গম জীবের মতন অধৈর্য প্রকাশ করে।

সে কথা, তন্ত্র Biology বা জীবতত্ত্বের এই নিয়মটা বহু পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, জীব যত ক্ষণ প্রাণ ধারণ করিয়া সজীব থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে অপর জীবের হিংসা করিতে হইবে। জীবের পুষ্টি জীবের দ্বারাই হইয়া থাকে, কোন জীব নির্জীব পদার্থ ভোজন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবী জীবে পূর্ণ, ধরাগর্ভস্থ রস জীবনদায়িনী শক্তিতে পূর্ণ, বৃক্ষ লতা পাতা, কীট পতঙ্গ জীবাণু, সবই জৈবী শক্তির দ্বারা সম্পুট ও সুরক্ষিত। নিরামিষ বৃক্ষ লতা পাতা খাইলে জীব খাওয়া হয়, দুগ্ধ ক্ষীর ঘৃতও প্রত্যক্ষ জীবাংশ ও জীবাণুপূর্ণত বটেই। মানুষের—মানুষের কেন, সকল জীব জন্তুর, স্থাবর জঙ্গমের এমন ভোজ্য সম্ভবে না, যাহাতে অন্য জীব নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু নাই, জীবনদায়িনী শক্তি নাই। কাজেই হিংসা না করিলে ভোজন হয় না, ভোজন না হইলে জীবন থাকে না। অতএব যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ হিংসা থাকিবেই। সিংহ শার্দূলকে হিংসার সাবয়ব মূর্তি বলা হয়। হিংসা হইতেই সিংহ শব্দের উৎপত্তি। এই হিংসার নাশে সৃষ্টির নাশ—জীবের নাশ, অন্য পদার্থসকলেরও সাবয়ব স্বতন্ত্র সত্তার নাশ হয়। শিব পরিণামের দেবতা, তাই তিনি বাঘাম্বর, অর্থাৎ মৃত হিংসার খোলসটা যেন তাঁহার কাছে থাকে, তাহাই যেন তাঁহার আবরণ! অর্থাৎ হিংসাবিরহিত জীবসত্তা তাঁহাতে যেন সম্পুটিত হইয়া আছে।

আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিসকলকে পুরাণের ভাষায় সর্প বা ভুজঙ্গম বলা হইয়াছে। এই শক্তিসমবায়ে বিশ্বসৃষ্টির বিন্যাস এবং বিকাশ। যখন শক্তির খেলা হয়, চারিদিকে বিকাশ হয়, তখন বিশ্বসৃষ্টি ফুটিয়া উঠে; তখন চারিদিকে সাপের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বিশ্ববিকাশের সঙ্কোচ ঘটে, তখন শক্তির সার শিবদেহে যাইয়া সঞ্চিত থাকে। সর্পের সার সর্পবিষ; সেই সর্পবিষ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের কণ্ঠস্থ—উদরস্থ নহে। উদরস্থ হইলে যদি হজম হইয়া যায়, আর না বাহির হয়, তাই শিব নীলকণ্ঠ হইয়া সর্পবিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। যখন আবার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন কণ্ঠের বিষ বাহির হইয়া নূতন ভাবে শক্তির বিধান সৃষ্টি করে,—তখন নীলকণ্ঠ নীললোহিত মহাদেবে পরিণত হন। এমনই ভাবে সংহারমূর্তি, শিবের মূর্তি, যাহা পুরাণের—কাব্যের কাল্পনিক ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহার একটা গূঢ় ব্যাখা পাওয়া যায়। কেবল অনুমানের সাহায্যে এমন ব্যাখ্যা করিতে হয় না, পুরাণ ও তন্ত্র এ ব্যাখ্যার পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এইবার শিবশক্তিসমন্বয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের কথাটা বলিব। বলিয়াছি ত, তন্ত্র generalisation করিতে বড়ই পটু। সংসারের তাবৎ ঘটনাকে গোটাকয়েক নিয়মের দ্বারা তন্ত্র বাঁধিতে চাহেন, বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তন্ত্র বলেন, যে পদ্ধতি অনুসারে দুইটা জীবের সম্মেলনে পরে বহু জীবের উৎপত্তি হয়, ঠিক সেই পদ্ধতির দ্বারায় জগৎসৃষ্টি হইয়াছে—হইতেছে। অনন্ত কাল পর্যন্ত অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইতে থাকিবে। সে পদ্ধতি কি? স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্বের সম্মেলনে—স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে—হইবে। এই তত্ত্বের অর্থবাদ শিবশক্তিসমন্বয়—allegory হইল শিবলিঙ্গের চারি ধারে গৌরীপট্টের আবেষ্টন। এই অর্থবাদের খাতিরে শিবলিঙ্গ কেবল শিবত্বের চিহ্ন মাত্র নহে,—প্রজননশক্তি সঞ্চারের প্রতীকস্বরূপ। গৌরীপট্টও তখন আর সার্ধত্রিবলয়াকার কুণ্ডলিনী শক্তি নহে, জীবসৃষ্টির জরায়ু—বীর্যাস্তের আধারস্থান। কেবল অলঙ্কারের খাতিরে, অর্থবাদের লোভে তন্ত্রের এবং পুরাণের কবিগণ শিব ও শক্তিকে নর নারীতে পরিণত করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বে রিরংসার ক্রিয়াটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপমা উপমেয়ের ব্যাপারটা এত দূর চালান হইয়াছে যে, শেষে লোকে আসল কথাটা, তত্ত্বকথাটা ভুলিয়া গিয়া, অর্থবাদের অংশটুকু—গল্পের ও অলঙ্কারের ভাগটুকুকেই আসল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

ইহা হইল তন্ত্রের কথা, সৃষ্টিতত্ত্বের একটা রহস্য মাত্র। কিন্তু শৈব সাধকগণ বলেন যে, আমরা তত্ত্ব বুঝিতে চাহি না, সংসারে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে চাহি না। আমরা চাহি জুড়াইতে—মুক্তি লাভ করিতে, নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে। যে শিবে সৃষ্টির সর্বস্ব যাইয়া সংহৃত হয়, সৃষ্টির সকল জীব যাইয়া শান্তি লাভ করে, যিনি নির্বাণের আধার—নির্বাণস্বরূপ, যাঁহাতে সূক্ষ্মভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, যিনি কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্বকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া লইতেছেন,—আমরা সেই করুণার আধার সদাশিবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহি। এই সংসারে গতাগতির জন্যই যত জ্বালা, যত কষ্ট, যত ক্ষোভ, যত বাধা। শিব সেই গতাগতির শেষ করেন—পরিসমাপ্তি ঘটান। আমরাও তাহাই চাই। অতএব এই 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ' শিবই আমাদের সেব্য—আরাধ্য—পূজ্য। এই পথের পথিক যে সকল শৈব, তাঁহারাই দক্ষিণামূর্তি শিবের পূজা করেন। সে শিবের গৌরীপট্ট নাই, শক্তির আবেষ্টন নাই, তিনি কেবল লিঙ্গ, কেবলই চিহ্ন, কেবলই প্রতীক, কেবলই স্থাণু।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য গোড়ায় এই দক্ষিণামূর্তি শিবের সাধক ছিলেন। এই শৈব সম্প্রদায়ের সহিত হীনযানী বৌদ্ধদের করুণা সাধনা ও নির্বাণতত্ত্বের বড় বেশী পার্থক্য নাই। ইহারা বুদ্ধদেবকে অবলোকিতেশ্বর মহাদেবে পরিণত করিয়া, তাঁহাতেই জীবের নির্বাণ প্রাপ্তির বিধান করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে এই মতটা এক সময়ে খুব প্রবল ছিল। মান্যবর মহারাজাধিরাজ মনীষী শ্রীযুত স্যর বিজয়চন্দ মহাতাব্ বাহাদুর সম্প্রতি বর্ধমানে এই মত অনুসারে অপূর্ব বিজয়ানন্দ বিহার নির্মাণ করিয়াছেন। ভাবুক মাত্রেরই সে বিহার দর্শন অবশ্য কর্তব্য। সে বিহার নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে 'শিবশক্তি' পুঁথি রচনা করিয়া তিনি ইঙ্গিতে এই সকল সিদ্ধান্তকথা সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিবশক্তি পুঁথিটা আগাগোড়া আমরা এই 'প্রবাহিণী'তে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া দিয়াছি। কূটস্থ চৈতন্যরূপী শিব কেমন করিয়া শক্তির ছলাকলাকে পরিহাস করিতে পারেন, তাহার ইঙ্গিত মনস্বী মহারাজাধিরাজ অতি সুন্দর ভাবেই করিয়াছেন। সে কথাটা খুলিয়া বুঝিতে হইলে মদনভস্মের অর্থবাদ, কুমার-সম্ভবের রোচক আখ্যায়িকার ভিতরকার তত্ত্বটুকু বুঝিতে হয়। এক বার পত্রান্তরে 'কার্তিকের জন্ম' বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আজ চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে এই তত্ত্বটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখন সেটা অরণ্যে রোদন হইয়াছিল, কেহই সে ভাবটা ধরিতে পারেন নাই। এখন যখন ধারাবাহিক-রূপে শিবতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তখন অবান্তরভাবে মদনভস্মের তত্ত্বটা বুঝাইতে পারিলে অন্ততঃ শিবসাধনার একটা স্তর বুঝিতে পারা যাইবে। তন্ত্র বলেন যে, শিব সাধনার দেবতা নহেন, শক্তিই সাধনার দেবতা। শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইলে শিবত্ব আপনিই ফুটিয়া উঠে। বৌদ্ধের করুণাবাদের পথ দিয়া যাইলে শিবসাধনার উপযোগিতা বেশ বুঝা যায়।

সে করুণাবাদ অতি কঠিন তত্ত্ব, সেই করুণাবাদের উপরই শিবের আশুতোষ ভাবটা ফুটিয়াছে। শিব আশুতোষ না হইলে সাধনার দেবতা হন না। কাজেই শিবত্ব বুঝিতে হইলে করুণাবাদটা বুঝিতেই হইবে। করুণাবাদ না বুঝিলে মহারাজাধিরাজের নূতন পুঁথি শিবশক্তির মাধুর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে না। তথাপি যতটুকু বুঝাইয়াছি, তাহা ধরিয়া শিবশক্তি পাঠ করিলে ভাব অনেকটা ধরা যাইতে পারে। করুণাবাদের কথা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রে একটু ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিয়াছেন। বুঝিবার পক্ষে তাহা কিন্তু পর্যাপ্ত নহে। যাহা হউক, করুণা-

বাদটা যে বাঙ্গালীর আধুনিক সাহিত্যে আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে, এটুকুর জন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। এই করুণার theory মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আকারান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই করুণার থিওরির উপরই 'অহিংসা পরম ধর্ম' সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। শাক্ত তন্ত্রসকল এই করুণাবাদের বিরোধী। আমার মনে হয়, শক্তিসাধনায় এই কঠোরতার প্রতিবাদস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি। কারণ, বৌদ্ধ শাস্ত্র পদে পদে তন্ত্রসিদ্ধান্তেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মও এই তন্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। এমন কি, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ও শৈব ধর্মও তন্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। আমাদের দেশে ও সমাজে যে কত ধর্মবিপ্লব, কত নূতন নূতন ধর্মমতের ও সম্প্রদায়ের যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া এখন কেহ বলিতে পারে না। এক একটি পুরাণ যেন এক একটি ধর্মভাবের প্রচারক, এক একখানি তন্ত্র যেন এক একটি নূতন ধর্মসাধনার প্রবর্তক। কত পুরাণ, কত উপপুরাণ, কত তন্ত্র, আগম নিগম যে আছে—পঞ্চ আম্নায়ের মধ্যে যে কত অসংখ্য পুঁথি আছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। তন্ত্রের পুঁথিসকলের মধ্যে সব আছে। সে সব খুঁজিয়া বাহির করা একটা মানুষের কাজ নহে, এক যুগেরও কাজ নহে! কারণ, আমার বিশ্বাস, তন্ত্রের শাক্তধর্ম সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্ম; ইহারই বেদীর উপর, ইহার প্রতিবাদস্বরূপ, ইহার সহিত আপোস করিয়া, ইহার উপর রং চড়াইয়া পরবর্তী সকল ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই তন্ত্রের অঙ্গে সকল ধর্মের ছায়া ও কায়া উভয়ই আছে। বৌধ ও শৈব করুণাবাদ বুঝিতে হইলে এই তন্ত্রেরই সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। সে পরের কথা, পরে হইবে। আপাততঃ আমরা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে আবার ধন্যবাদ করিতেছি যে, তিনি বিজয়ানন্দ বিহার রচিয়া, এবং শিবশক্তি পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালায় একটা লুপ্ত ভাবের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আর একটু বলিয়া রাখা ভাল যে, শৈব ধর্মের মধ্যে নাথী সম্প্রদায়ের হাত অনেকটা আছে। গোরক্ষনাথ, আদিনাথ, স্বয়ম্ভুনাথের অনেক ব্যাখ্যান ও বিকৃতি শৈব ধর্মের মধ্যে সম্পুটিত হইয়া আছে। নাথদের প্রভাব এক কালে বাঙ্গালায় অতিমাত্রায় ছিল। এখনও তাহাদের লুপ্ত পদচিহ্ন বাঙ্গালার বহু স্থানে খুঁজিলে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় জৈন ধর্মের প্রভাবও খুব ছিল। জৈনদের অনেক কথা শৈব সম্প্রদায় স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া

রাখিয়াছেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দক্ষিণামূর্তি শিবের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালার ও দক্ষিণাত্যের গোড়ার কথা যেন টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখ এই, ক্ষোভ এই যে, বাঙ্গালায় এখন তেমন পণ্ডিত নাই, পাণ্ডিত্য সংগ্রহের সে উপাদান নাই, আয়োজনও নাই। আঁধার ঘরে দীপের আলো লোকে দূর হইতে দেখিবে ও অবাক্ হইয়া থাকিবে; নহে ত যাহারা মূর্খ ও অজ্ঞ, তাহারা অহঙ্কারের উপর ভর করিয়া ব্যর্থ বাদ প্রতিবাদ চালাইবে। সে বাদ প্রতিবাদে দলাদলি বাড়িবে, জ্ঞানান্বেষণ যথারীতি হইবে না। তুমি জান না, তোমার মনে কি আছে, ছার আমরা, তোমার নিমিত্ত মাত্র হইবারও যোগ্য নহি।

২

শিব শক্তি—শূন্য কখনই নহেন। যখন তিনি শক্তিসমাচ্ছন্ন—তাঁহাতে শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তখন তিনি বাক্য মনের অগোচর, কেবল সনাতন পুরুষ মাত্র। তখন শিব একা বসিয়া আছেন, এক তানপুরা লইয়া, শব্দ-ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া নিজের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আছেন। তখন বিশ্বসৃষ্টি তাঁহাতে সংবৃত, তাঁহার মধ্যে যেন সম্পুটিত। তখন তাঁহাতে কোন চেষ্টা নাই, কেবল তিনি বিরাজ করিতেছেন। এ অবস্থা মনুষ্যের চিন্তার অতীত—কল্পনার অতীত; কিন্তু যখন তানপুরা বাজিয়া উঠে, শব্দব্রহ্মে ঝঙ্কার হয়, তখনই মহাবাক্য উত্থিত হয়। সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক আমি বহু হইব, এই ইচ্ছাশক্তি যেন জাগরিতা হন। এই ইচ্ছা বেশ জমাট বাঁধিলেই, সৃষ্টিশক্তি কিশোরী গৌরীরূপে তাঁহার বাম উরুর উপর জাগিয়া বসেন। তখন এক হইতে দুইয়ের উৎপত্তি হয়। এই দুই হইতেই, এই শিবগৌরী হইতেই জগতের সৃষ্টি—বিশ্বের বিকাশ। বিশ্বের স্তরে স্তরে যেমন বিকাশ ঘটিতে থাকে, তেমনি স্তরে স্তরে আদ্যা শক্তির দশ মহাবিদ্যা রূপ ফুটিয়া উঠে। যেই ক্ষণ হইতে সৃষ্টি আরম্ভ, সেই ক্ষণ হইতেই নাশেরও উদ্ভব। অপচয় ও উপচয় এক সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে; মা যে মুহূর্তে উমা, সেই মুহূর্তে কালী। কারণ, ক্রিয়ার অর্থই উপচয় এবং অপচয়; এক দিকে উপচয়, অন্য দিকে অপচয়; এক দিকে ক্ষরণ, অন্য দিকে বিকাশ। ক্রিয়া না হইলে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি একটা ক্রিয়া মাত্র। শক্তি সঞ্চালিত—

আন্দোলিত—স্পন্দিত হইলেই ক্রিয়া হইল। শক্তির স্পন্দন—আন্দোলন—সঞ্চালন তখনই হয়, যখন এক দিকে অপচয়, অন্য দিকে উপচয় ঘটে। সুতরাং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ দেখা দিবেই, জনমের সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসিবেই। তাই সদাশিবে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনই বিদ্যমান; তাই উমা দেখা দিলেই কালী এবং ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী ও বগলা দেখা দিয়া থাকেন। এক বিদ্যার বিকাশ হইলে, অন্য নয়টা বিদ্যা ফুটিয়া উঠেন।

যখন সৃষ্টির খেলা পুরাদমে চলিতে থাকে, তখন শক্তি কালীরূপে বিকশিতা। শিব শবাকারে চরণতলে পড়িয়া আছেন, মা শিবের বুকের উপর দাঁড়াইয়া অসংখ্য যোগিনী সঙ্গে নাচিতেছেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ হইতেছে, নাশের সঙ্গে নূতন সৃষ্টির বিকাশ হইতেছে। আদ্যা শক্তি এক খাইতেছেন, আর গড়িতেছেন, আবার খাইতেছেন, আবার গড়িতেছেন। জনন মরণের এই পরম্পরা অনন্ত শৃঙ্খলের আকারে যেন তাঁহার ব্যাদিত বদনের মধ্য দিয়া কেবল যাইতেছে, তাহার যেন আগা নাই, গোড়া নাই, আদি নাই, অন্ত নাই—কেবল চলিয়াছে নদীপ্রবাহের মতন, অনন্ত জলপ্রপাতের মতন কেবল চলিয়াছে, কেবল ঝংকার ঝরিতেছে। ইহাই সৃষ্টি শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এ সময়ে শিবের শিবত্ব যেন ঢাকা পড়িয়া যায়, শিব যেন শবের মতন হইয়া যান। আর শক্তি তখন উন্মাদিনী—কোটি রূপে, কোটি ভাবে অসংখ্য দিক্ দিয়া বিকশিতা; তখন মায়ের খেলা যে কত রকমে দেখা যায়, তাহা আর হিসাব করিয়া বলা যায় না। তখন শক্তি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র ও সর্বস্বে প্রকটরূপা; তখন শক্তি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। আর কাহারও খোঁজ পাওয়া যায় না। তখনকারই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত গান করিয়াছেন—

"বাজবে মহেশের বুকে
নেবে নাচ গো ক্ষেপা মাগী।"

অমন পাগলিনীর মত নাচিও না মা, বেচারা শিবের বুকখানা যে তোমার চরণতাড়নের চোটে ফাটিয়া যাইবে। যদি তুমি অমন ভাবে না নাচিয়া থাকিতে না পার, তবে পাগলী মেয়ে, শিবের বুক হইতে নামিয়া নৃত্য কর। কিন্তু তাহা ত হইবার জো নাই। শিবের বুকের উপর ছাড়া, মা আমার অন্য কোথাও নাচিতে পারে না; শিবের বুক ছাড়া তাঁহার নাচিবার অন্ত স্থানও নাই। কারণ, শিব যে সর্বব্যাপী, সে অখণ্ড সত্তা সর্বস্বে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মা যেমন সর্বব্যাপিনী, শিবও তেমনি সর্বাধারভূত। সুতরাং নাচিতে হইলে মাকে শিবের বুকের উপরেই নাচিতে হয়। কল্পলতিকা তিনি, কল্পক্রম শিবের চারি দিকে, সর্বাবয়বে জড়াইয়া লতাইয়া আছেন। তাই রঙ্গ করিয়া ভক্ত বলিয়াছেন,—"নেবে নাচ গো ক্ষেপা মাগী।' নেবে নাচিবার মায়ের উপায় নাই—শক্তি নাই। শিব ছাড়া শক্তি ফুটিতেই পারে না ;—শিবদেহসমাশ্রিত বলিয়াই শক্তি গতিরূপিণী ও লীলাময়ী। পক্ষান্তরে তেমনই শক্তি ছাড়া শিব থাকিতেই পারেন না। শক্তি প্রকটই হউক, অথবা সম্পুটিতাই হউক সদাই শিবদেহসমাশ্রিত। যখন শক্তি সংহৃতা, তখন শিব আত্মারাম, মহাযোগে নিমগ্ন। যখন শক্তি প্রকট, তখনও শিব যোগ-বিভোর বটে, পরন্তু ইচ্ছাময়। তাঁহা হইতে সিসৃক্ষা বা সৃজনইচ্ছা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর ক্ষণে ক্ষণে এক এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতেছে—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও বিলয় তাঁহাতেই হইতেছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে লীলা অহরহঃ হইতেছে, প্রত্যেক জীবের দেহভাণ্ডেও সেই শিবশক্তির লীলা অহরহঃ চলিতেছে। দেহভাণ্ডে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিতা, আর 'আমি আছি' এই শিবজ্ঞান অখণ্ডভাবে তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। জীবন শক্তির একটা লেখা বটে, শক্তি নানা ভাবে লীলা করিয়া জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন বটে, পরন্তু 'আমি আছি' এই শিবজ্ঞান অব্যাহত ভাবে শক্তির খেলার মধ্যগত হইয়া না থাকিলে, শক্তির নানা বিকাশকে কেন্দ্রগত না করিলে জীবের জীবত্বই সম্ভবপর হয় না। স্থাবর, জঙ্গম, সকল প্রকার জীবেই 'আমি আছি' এই জ্ঞানটা থাকিবেই। দেহাবচ্ছিন্ন আমি দেহেতেই বিরাজ করিতেছি, অন্য পদার্থ-সকল হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করিতেছি, এই জ্ঞান যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ সেই দেহ সজীব থাকিবে। নহিলে শক্তি জড়শক্তি মাত্র—প্রাণহীন, জ্ঞানহীন শক্তি মাত্র। কোন কোন তন্ত্রে ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, জড় ও অজড় বুঝি না, সকল পদার্থেই, সকল শক্তির খেলাতেই, যেখানে স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইখানেই, যেখানে পদার্থের বিশিষ্টতা আছে, সেই পদার্থেই শিব ও শক্তি বিদ্যমান আছেন। বিশ্বসৃষ্টিতে শিবশক্তিবর্জিত কিছু হইতে পারে না, কিছু থাকিতে পারে না। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু আছে,—হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে, সে সকলেই শিবশক্তি আছে। শক্তির এক প্রকারের বিকাশকে আমরা জীব বলি, অন্য প্রকারের প্রকাশকে জড় বলি ;

প্রকৃতপক্ষে জড় ও অজড়, জীব ও জড়, দুই এক, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জীবসামান্য ধর্ম জড় পদার্থেও আবিষ্কার করিয়াছেন। জড়েরও এক প্রকারের অনুভূতি আছে, উপচয় অপচয় আছে। যখন জড়ে ও জীবে শক্তিক্রিয়ার একরকম পরিণতি ঘটিতেছে, তখন জড় ও জীব দুই এক, কেবল অবস্থার বিকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র প্রকারের। এই হিসাবে তন্ত্র বলেন যে, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ আছে, অনুভূতিশক্তি আছে, সুখদুঃখবোধ আছে। এই মেদিনীমণ্ডল একটা সজীব পদার্থ, সৌর মণ্ডল একটা প্রাণযুক্ত যন্ত্র মাত্র—দেহী পুরুষস্বরূপ। তাহার উপর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট জীব, বিরাট পুরুষ। যেমন মনুষ্য বা পশুদেহ জীবসমবায়ে স্বতন্ত্র সত্তারূপে বিদ্যমান, তেমনি পৃথিবীটা জীবসমবায়ে সত্তারূপে—জীবরূপে বিরাজমান। তাহার উপর সৌরমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড একটা স্বতন্ত্র পুরুষ—একটা বিরাট জীব। এমনই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-জীবে এই অনন্ত আকাশ পরিপূর্ণ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-জীবপূর্ণ আকাশ আবার এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত। আত্মাশূন্য স্থান নাই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বিশ্বাত্মার সাগর। সেই সাগরের একটি বুদ্‌বুদ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। সৃষ্টিতত্ত্বের এমন grand idea, এমন বিরাট ভাব আর কোন জাতির কোন শাস্ত্রে আছে কি না, জানি না। এ ভাব ভারতবাসীর মাথাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষেই এখনও নিবদ্ধ আছে।

তন্ত্র এই সঙ্গে বলিতেছেন যে, জীবের কলেবরে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই ক্রিয়া তেমন ভাবেই হইতেছে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, মনুষ্যদেহেও সেই ক্রিয়া তেমন ভাবেই হইতেছে। তাই পৃথিবী একটা জীব, মেদিনীর শ্বাস প্রশ্বাস আছে, সুখ দুঃখবোধ আছে, কুণ্ডলী শক্তির ক্রিয়া আছে, এক অপূর্ব ভাষার সাহায্যে ভাবের অভিব্যঞ্জনা আছে। তন্ত্র বলেন যে, জীব ছাড়া জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। পৃথিবী হইতে যখন নানা জীব সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন পৃথিবী সজীব পদার্থ। যতক্ষণ সৃষ্টিলীলা চলিতে থাকে, ততক্ষণ কোন জীবের, কোন পদার্থের নাশ নাই, কেবল অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ঘটে মাত্র। যতক্ষণ শিবশক্তির লীলা চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ কিছুরই নাশ হইবে না। তাই তান্ত্রিক ভক্ত বলিয়া থাকেন যে, মা থাকিতে ছেলে মরে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতক্ষণ মায়ের লীলা হইতে থাকিবে, ততক্ষণ মায়ের ছেলে মরিবে না। এক

দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে, পরন্তু শিবশক্তি-সমুৎপন্ন জীব—'আমি আছি' এই জ্ঞান, 'আমার আছে' এই বোধ, আমিত্ব বিস্তারের এই শক্তি কখনই নষ্ট হইবার নহে। কারণ, উহার নাশ ঘটিলে সৃষ্টির নাশ ঘটিয়া থাকে; তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা হইবার নহে। অতএব তন্ত্রের প্রবচন যে, মা-বাপ থাকিতে ছেলে মরে না, উহা সত্য।

এইবার তন্ত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বিবাদ বাধাইয়াছেন। শাক্ত তন্ত্র মাত্রেই লেখা আছে যে, অহিংসা পরম ধর্ম, এমন কথা হইতেই পারে না। উহা অস্বাভাবিক কথা। জীবনই হিংসা, হিংসা না হইলে জীবন থাকে না, মায়ের বাহন হিংসার অবতার সিংহ। তুমি খাইবে কি? যাহা খাইবে, তাহাই জীবন, জীবহত্যা না করিলে তোমার ভোজ্যই প্রস্তুত হইবে না। পশু মারিয়া মাংস খাইতে হইলে, মুমূর্ষু পশুর কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাও, তোমার দুর্বল স্নায়ু বিচলিত হয়, তুমি দয়াপরবশ হইয়া মাংসভোজন পরিহার কর। কিন্তু গাছের ফল ছিঁড়িলে বৃক্ষ রোদন করে না? তাহার বেদনার অশ্রুধারায় যে তাহার সর্বাঙ্গ ভাসিয়া যায়। সে রোদনের ভাষা শুনিতে পাও না, বুঝিতে পার না, তোমার দয়া হয় না। গোবৎসকে বঞ্চিত করিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ পান কর কোন্ হিসাবে? তোমার জননীর স্তনযুগল হইতে যে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হয়, বিধাতার বিধানে তাহা তোমার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি তাহা পরকে খাইতে দিলে বাঁচিতে পার কি? তেমনি ছাগ ও গাভীশিশুকে রক্ষা করিবার জন্য আদ্যা শক্তি মাতৃদুগ্ধরূপে তাহাদের জননীর স্তনে বিরাজ করেন। তুমি তাহা পান কর কোন্ লজ্জায়? ছাগ বা মৃগমাংস ভোজন করা যদি পাপ হয়, তাহা হইলে দুগ্ধপান, ক্ষীরভোজন মহাপাপ; তাহা হইলে কোটি কোটি জীব নষ্ট করিয়া গোধূম, ধান্য, ব্রীহি প্রভৃতি শস্য, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল, কন্দ মূল, পত্র পুষ্প ভোজন করা অতিপাতক। আত্মরক্ষায় দয়া নাই, হিংসাই আছে। কোনটা বা প্রকট হিংসা—মনুষ্যের অনুভূতিগম্য হিংসা, কোনটা বা অপ্রকট হিংসা, মনুষ্যের অনুভূতির বাহিরের হিংসা। তুমি উঠিতে বসিতে, শুইতে খাইতে জীবহত্যা করিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে কত জীব সৃষ্টিও করিতেছ। তুমি হিংসা ছাড়া থাকিতে পার কি? তোমার দেহের মধ্যে কত জীব, অন্য কত জীবকে সদা সর্বদা খাইতেছে। তাহা রোধ করিতে পার কি? জীবের দ্বারাই জীবের পুষ্টি হইতেছে, বিস্তৃত ঘটিতেছে। একটা বড় জীবের অবস্থিতির

জন্ত কোটি ক্ষুদ্র জীবকে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ দিতে হইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটান যায় না, কখনও ব্যত্যয় হয় না। তন্ত্রের এই প্রতিবাদের উত্তর হীনযানী বৌদ্ধ দিতে পারেন নাই। তাঁহারা উত্তরে নীতির কথা, সমাজের কথা তুলিয়াছেন। তবে তন্ত্র বলেন যে, যাহার যাহা সহ্য হয়, সে তাহাই খাইবে। ঘাস খাইলে সিংহ ব্যাঘ্র বাঁচিতে পারে না, ঘাস সিংহ ব্যাঘ্রের খাদ্য নহে; মাংস খাইলে গো, ছাগ, মেষ, মৃগাদি বাঁচে না, মাংস উহাদের খাদ্য নহে। তেমনি মানুষের ধাতু অনুসারে, দেশ ও কাল অনুসারে যখন যাহা খাদ্য, তখন মানুষ তাহাই খাইবে। আহারের বিচারে মানুষের উচ্চ নীচ বিচার করিতে নাই এবং মানুষের যাহা খাদ্য, তাহা সবই পবিত্র—হেয় নহে, বর্জনীয় নহে; মানুষ যাহা খায়, তাহাই মায়ের বলি; যাহা খায় না, তাহা মাকে নিবেদন করিতে নাই। যত জীব, তত শিব, প্রত্যেক দেহাবচ্ছিন্ন শিবের চারি পার্শ্বে কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া হইতেছে, সেই কুণ্ডলিনীকে তুষ্টা রাখিবার জন্যই মাকে ভোগ দিতে হয়, জীবের ভোজ্য স্থির করিতে হয়। এই জন্য বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে আগমবাগীশ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানুষ যাহা খাইবে, তাহাই মায়ের প্রসাদ, পঞ্চ তত্ত্বে বা পঞ্চ মকারে মাকে তাহাই দিতে হইবে। তাই মা সৃষ্টিতত্ত্বে এবং সংহারতত্ত্বে সর্বব্যাপারেই ছিন্নমস্তা, নিজের শোণিত নিজে পান করিতেছেন, সে শোণিতে নিজে পুষ্ট হইতেছেন। ইহাই সৃষ্টির যোগ্য, গুপ্ত এবং অব্যক্ত লীলা।

শিব ও শক্তির সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব বুঝাইয়া তন্ত্র তাঁহাদের রূপের কথা কহিয়াছেন। নাম ও রূপ না বুঝিলে রূপতত্ত্ব বুঝা যায় না। রূপের দুইটা স্তর আছে,—এক অনুভূতিগম্য রূপ, আর বোধাতীত রূপ। বোধাতীত যাহা, তাহা বুঝান যায় না; সুতরাং সে কথা চাপা থাকাই ভাল। অনুভূতিগম্য রূপও দুই শ্রেণীর—এক জ্ঞানাভাস বা Concept, দ্বিতীয় বোধাভাস বা Percept। বোধের আভাস যাহা, অনুভূতিগম্য যাহা, তাহারই আলোচনা করিতে হয়। সে কথা পরে বলিব। শিবের Concept এবং Percept দুইয়ের সুন্দর বিশ্লেষণ তন্ত্রে আছে। এই জ্ঞানাভাস ও বোধাভাস লইয়াই মায়ের দশ মহাবিদ্যার রূপ নির্ণীত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন, সে কথা গুরুমুখ করিয়া শুনিতে হয়। অর্থাৎ যাহার মুখে শুনিবে, তাহাকে প্রথমে গুরুর পদে বরণ করিতে হইবে। সুতরাং সে সকলের ব্যাখ্যা করিবার অধিকার আমার নাই। যতটুকু ছিল ততটুকু পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছি। এখন পরে অন্য কথা বলিব।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

নবরাত্র

নবরাত্রির উৎসব ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সুদূর ত্রিবাঙ্কুর হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত, গান্ধার হইতে আসাম পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের দশকর্মান্বিত হিন্দু মাত্রেরই গৃহে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে নবমী তিথির শেষ যাম পর্যন্ত এই নয় রাত্রের জন্য চণ্ডিকার ঘট স্থাপিত হয়; যন্ত্রে দেবীর পূজা হয় এবং দুর্গাপাঠ অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ হইয়া থাকে। বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব,—এমন কি, রামানুজাচার্যের, বল্লভাচার্যের, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নবরাত্রের ব্রত এবং উৎসব করিয়া থাকেন। দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া কোথাও পূজা হয় না; সর্বত্র যন্ত্রে এবং ঘটে দেবী পূজিত হইয়া থাকেন। কাশী, জ্বালামুখী, হিঙ্গলাজ, কামরূপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে, যেখানে দেবীর যন্ত্র এবং পীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু, মন্দিরে যাইয়া সঙ্কল্প করিয়া দুর্গাপাঠ বা চণ্ডীপাঠ করিয়া আসেন। যাঁহারা পাঠ করিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রবণ করেন। এমন সম্প্রদায়নির্বিশেষে সর্বব্যাপী উৎসব আর আছে কি না বলিতে পারি না। ইহার এতটা ব্যাপ্তি কেন হইল, কিসের জন্য হইল, তাহাও বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের হিন্দু গৃহস্থের ধারণা যে, নবরাত্রের সময়ে গৃহে চণ্ডীপাঠ না হইলে গৃহে অমঙ্গল ঘটে। বিশেষতঃ কুলাঙ্গনাগণ ত দুর্গাপাঠের ব্যবস্থা করিবেনই; তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ভবানীর কল্যাণে পুত্র কন্যা নীরোগে এবং সুখে থাকে। অতএব শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গৃহে নবরাত্রের ঘট বসাইবেনই।

কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং বাঙ্গালার শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবরাত্রের উৎসবের একটু বিশিষ্টতা আছে। গুর্জর বা লাটপ্রদেশের শাক্তগণও একটু বিশেষ ভাবে এই উৎসব করিয়া থাকেন। যে দেশে দেবী যে নামে পরিচিতা, সেই দেশে নবরাত্রের উৎসব শাক্তগণের মধ্যে সেই দেবীর নামেই পরিচিত। যথা, কাশ্মীরে অম্বা দেবীর পূজা, রাজপুতানায়, বিশেষতঃ মিবারে

ভবানী দেবীর পূজা, গুজরাটে এবং হিঙ্গলাজে হিঙ্গলা বা রুদ্রাণীর পূজা, কান্যকুব্জে কল্যাণীয় উৎসব ও পূজা, মিথিলায় উমার পূজা, বাঙ্গালায় শ্রীদুর্গা বা ভদ্রকালীর পূজা প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল প্রদেশেই অম্বা বা অম্বিকার পূজা বলিয়া নবরাত্রের উৎসব বিখ্যাত। অবশ্য কামরূপে কামাখ্যা দেবী ছাড়া অন্য কাহারও পূজা হয় না। কালীঘাটে, মায়ের চক্রের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র ভাবে মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া মায়ের পূজা করিতে পারেন না, প্রত্যেক গৃহস্থকেই মায়ের মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিতে হয়। কাশীতেও তেমনি অন্নপূর্ণার চক্রের মধ্যে বা দুর্গাবাড়ীর আয়তনের ভিতরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে ঘট স্থাপন পর্যন্ত করেন না। তন্ত্রের নির্দেশই এই যে, মহাপীঠস্থানে, যেখানে শক্তির সিদ্ধ যন্ত্রসকল অনাদি কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে স্বতন্ত্র ভাবে মায়ের বোধনের প্রয়োজন নাই। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষব্যাপী সকল শক্তিতীর্থ সাধনার স্থান বলিয়া, গুরুপরম্পরার সিদ্ধিলাভের প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত, অর্চিত এবং পূজ্য। এক এক স্থানে এক একটা শাক্ত যন্ত্র সিদ্ধপীঠ বলিয়া রক্ষিত আছে। পরে ভক্ত ভাবুকগণ সেই পীঠ বা যন্ত্রের উপর এক একটা শক্তিমূর্তির পরিকল্পনা করিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক একখানা কষ্টিপাথরের খণ্ডের উপর যন্ত্র অঙ্কিত আছে, সেই যন্ত্রের উপরে সোনার বা রূপার মুখ ও হাত পা বসাইয়া প্রতিমা খাড়া করা হইয়াছে। অথবা সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর একটা মুখ কুঁদিয়া খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। মূর্তি বা প্রতিমা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, যন্ত্র বা আসন স্মরণাতীত কাল হইতে বিরাজিত। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, কামরূপ প্রভৃতি স্থান তীর্থ নাম কেন ধারণ করিল, কোন্ পদ্ধতি অনুসারে ভারতবর্ষের শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব তীর্থসকল প্রতিষ্ঠিত, তাহার আলোচনা সময়ান্তরে করিতে পারি। তবে এখন এইটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, এই তীর্থসকলের পশ্চাতে ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির অনেকটা বিস্মৃত ইতিহাসকথা, সমাজ ও ধর্মের উত্থান পতনের কথা লুকান আছে। তন্ত্র যে ভাবে তীর্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে একটা কি দুইটা স্তরের খবর পাওয়া যায়; দুইটা কি তিনটা যুগের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অতীত যুগের আরও অনেক কথা যে এক একটা তীর্থের সহিত সংলগ্ন আছে, তাহা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই অনুমানে জানা যায়।

কেবলই তীর্থক্ষেত্র কেন, প্রত্যেক উৎসবের অন্তরালে ভারতবর্ষের বহু অতীত যুগের বিস্মৃত ইতিহাস লুকান আছে। এই নবরাত্রের উৎসবে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ ঘটের মুখে ধান্যের শীর্ষ গুচ্ছে গুচ্ছে বসাইয়া দেবীকে ধান্যক্ষেত্রের ঈশ্বরী হিসাবে অর্চনা করিয়া থাকেন। রাজপুতানার বৈশ্য কৃষকগণও ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেবীর পূজা করেন। আবার কাশ্মীরে এবং পাঞ্জাবে বাসন্তী নবরাত্রের সময়ে যব ও গোধূমের শীর্ষ সহ মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। বলিতে ভুলিয়াছি যে, নবরাত্রের উৎসব দুইটা আছে; একটা শরৎকালে, অন্যটা বসন্তকালে বাসন্তী নবরাত্র। ইহা দেখিয়া ম্যাক্সমূলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, নবরাত্রের উৎসব আর কিছুই নহে, অতি পুরাকালের Harvest-ceremony, যুগে যুগে নূতন নূতন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া নূতন নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। এ কথার আলোচনা, যাঁহারা comparative mythologyর চর্চা করেন, তাঁহারাই করিবেন। তবে নবরাত্রের ব্রত এবং উৎসব যে ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশব্যাপী উৎসব, তাহা যিনি হিন্দু গৃহস্থের ব্রত নিয়মের সমাচার রাখেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্গোৎসব বড়ই জাঁকাল ব্যাপার, এত বড় জাঁকাল কাণ্ড ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে আছে কি না বলিতে পারি না। এত অর্থব্যয়, এমন গ্রামে গ্রামে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব, এমন ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নব বস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হিন্দুর অন্য কোন উৎসবে হয় কি না, জানি না। হিন্দুস্থানের হোলি উৎসব সর্বজনীন উৎসব বটে, কিন্তু তাহাতে একটা জাঁক নাই, এমন অর্থব্যয় নাই, এমন নানা ভাবের সমাহার নাই। বসন্তের হোলি উৎসব এক-রসপ্রধান, কেবল আদিরসের অভিব্যঞ্জনা মাত্র; কেন না, উহা যে পুরাকালের মদনোৎসবের আকারান্তর। যাউক অন্য কথা, এইবার বাঙ্গালার শ্লাঘা, বাঙ্গালীর গর্ব এই দুর্গোৎসব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দুর্গোৎসব

বাঙ্গালার দুর্গোৎসবের তিনটা স্তর আছে। একটা খাঁটি তন্ত্রের বা শক্তি আরাধনার স্তর, দ্বিতীয় শাক্ত পুরাণের স্তর; তৃতীয় সামাজিক স্তর। তিনটি পুরাণ দুর্গাপূজায় মান্য; অর্থাৎ তিনটি পুরাণের কোন একটি পুরাণের পদ্ধতি

মান্ত করিয়া থাকেন। প্রথম বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত পদ্ধতি, দ্বিতীয় দেবী-পুরাণোক্ত পদ্ধতি, তৃতীয় কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতি। গৃহস্থের দীক্ষামন্ত্রের অনুসারে পূজার পদ্ধতি নির্ণীত হইয়া থাকে। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা প্রায়ই বৃহন্নন্দিকেশ্বরের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শৈব বা স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা পূর্ণভাবে শাসিত, তাঁহারা দেবীপুরাণ মান্ত করেন, এবং ঘোর শাক্ত যাঁহারা, তাঁহারা কালিকাপুরাণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অথবা পুরুষ-পরম্পরায় যাঁহারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁহারা সেই পদ্ধতি অনুসারেই কাজ করেন। এই তিন পদ্ধতির মধ্যে মন্ত্রের, পূজার ক্রমের এবং আরাধনার অনেক পার্থক্য আছে। যাঁহার নামে সঙ্কল্প হয়, তিনি ব্রাহ্মণ হইলে পূজা তাঁহাকেই করিতে হয়। সকল সময়ে গৃহস্থ এত বড় কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াই গুরু বা পুরোহিতকে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা হয়। দুর্গোৎসব প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য ; ইহা ঠিক কাম্য কর্ম নহে, অনেকটা নিত্যকর্মের মতন। যাঁহারা যেমন সামর্থ্য, তিনি তদনুসারে পূজা করিবেন। নবরাত্রের ব্রত ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থেরই কর্তব্য, দুর্গোৎসবও নবরাত্রের মতন বাঙ্গালার হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই কর্তব্য। ঘটে পটে মায়ের পূজা হয়, শুদ্ধ গঙ্গোদকে বিল্বদলে মায়ের পূজা হয় ; কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করিলেও মায়ের পূজা হয়। এই পূজার তিনটি প্রধান অঙ্গ। প্রথম বোধন, দ্বিতীয় সম্বর্দ্ধনা, তৃতীয় বিসর্জন। কল্পারম্ভ বা বোধন সাত রকমের,—নবম্যাদি কল্প, অর্থাৎ অপর পক্ষের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে কল্পারম্ভ করিয়া এক মাস কাল মাতাকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে ; প্রতিপদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি, মহাষ্টমী ও কেবল মহানবমীর কল্প বা বোধন আছে। অন্ততঃ এক দিনের জন্যও মায়ের বোধন করিতে হইবে। তান্ত্রিক শক্তি আরাধনার হিসাবে দেবীপূজা করিতে হইলে কঠোর ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া গৃহস্থকে স্বয়ং কুণ্ডলিনীকে জাগরণ করাইতে হয়। তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে নবম্যাদি কল্পই প্রশস্ত ; প্রতিপদ্ আদি কল্পও সাধনার পক্ষে অপ্রশস্ত নহে। ইহা উৎসব নহে, সাধনা ; এ সাধনা বিল্বমূলে বসিয়া গোপনে করিতে হয়।

শক্তি আরাধনা

শরৎকালের দুর্গোৎসব দক্ষিণায়নে, দেবনিদ্রার কালে হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত দেবনিদ্রার কাল; এ সময়ে সূর্য্য অয়নের দক্ষিণাংশে মকর রাশির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন; এ সময় বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রশস্ত সময় নহে, তন্ত্রের আরাধনাও এই সময়ে করিতে নাই। ইহাকে অকাল বলে, পিতৃপক্ষের কালও বলে। এই অকালে দেবীর পূজা করিতে হয় বলিয়া, এ পূজায় বোধনের আড়ম্বর খুব বেশী। কারণ, দেবনিদ্রার কালে, দেহস্থা কুণ্ডলিনী শক্তিও নিদ্রিতা থাকেন, তাঁহাকে জাগাইয়া তোলাই শরৎকালের দুর্গোৎসবের প্রধান অঙ্গ। তন্ত্র বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মনুষ্য-দেহভাণ্ডেও তাহাই আছে, এবং যাহা নাই দেহভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। তন্ত্র বলেন, দেহস্থা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কুণ্ডলিনীর সহিত মিলাইতে পারিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল, মুক্তির পথ প্রশস্ত হইল। দেহস্থ আত্মাই যে বিশ্বব্যাপী আত্মা, সাধনার দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ হইতে পারে। এই হেতু তন্ত্র বাহিরের দেবতা মানেন না। তন্ত্র বলেন, তোমার আত্মাই তোমার ইষ্ট, তোমার পরমেশ্বর, তোমার পূজ্য এবং আরাধ্য। আত্মা ছাড়া দেহে যেমন অন্য শক্তি নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি পরমাত্মা ছাড়া অন্য শক্তির খেলা হয় না। দেহস্থ আত্মার সহিত বিশ্বব্যাপী আত্মাকে মিলাইতে পারিলেই সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। সে আত্মাকে পাইতে হইলে কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হইবে। এই জাগরণকেই বোধন বলে। তন্ত্র আরও একটা কথা বলেন। তন্ত্র বলেন যে, বাহ্য প্রকৃতির সহিত দেহগত অন্তঃপ্রকৃতির পূর্ণ সমতা আছে। বাহিরের জগতে যদি ছয়টা ঋতু থাকে, অর্থাৎ ছয় প্রকারের পরিবর্ত্তন থাকে, তাহা হইলে যে দেশে ছয় ঋতুর প্রভাব আছে, সেই দেশবাসী নরনারীর দেহেও ছয় ঋতুর বিকাশ হইবেই। বাহিরে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন আছে, দেহের মধ্যেও উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন থাকিবেই। যে দেহে বাহ্য প্রকৃতির সহিত এইরূপ সমতা নাই, সে দেহ রুগ্ন;—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—ধর্ম্মসাধনের পক্ষে মনুষ্য-শরীরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন, অতএব রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেহের দ্বারা তন্ত্রসাধনা ত হয়ই না, কোন ধর্ম্মসাধনই সম্ভবপর নহে।

দেহটাকে শক্তি আরাধনার উপযোগী করিবার জন্য ব্রতপক্ষ হইতে সাধককে উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে হয়। ব্রতপক্ষের বিধিনিষেধের মধ্যে পক্ষকাল থাকিলে দেহগত বহু অসামঞ্জস্য নষ্ট হয়; তাহার পর পিতৃপক্ষ বা তর্পণপক্ষ। দেবনিদ্রার কালে পিতৃগণ জাগিয়া থাকেন; এ সময়ে দেবতার সাহায্যলাভ সুবিধাজনক নহে, অতএব পিতৃগণের আরাধনা করিয়া, তাঁহাদের কৃপায় কতকটা শক্তিসঞ্চয় করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ তন্ত্র বলেন, শক্তিসাধনা করিতে হইলে, বংশের ধারা পবিত্র রাখিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয়; পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের মধ্যে সিদ্ধ সাধক কেহ থাকিলে তাঁহার প্রভাবে সাধক অনেকটা অগ্রসর হইতে পারেন। কারণ, যে দেহ লইয়া সাধনা করিতে হইবে, যাঁহাদের কৃপায় সেই দেহ লাভ করিয়াছ, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে পারিলে, তাঁহাদের আশীর্বাদে বহু বাধাবিঘ্ন দূর হয়। শক্তি আরাধনায় পিতৃগণই প্রধান অবলম্বন। তাই তর্পণপক্ষে পিতৃপুরুষগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাঁহাদের আশীর্বাদ মাথায় করিয়া দেবীপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে মায়ের বোধন আরম্ভ করিতে হয়। তাই দেবীপক্ষের পূর্বেই পিতৃপক্ষ এবং পিতৃপক্ষের পূর্বেই ব্রতপক্ষ; ব্রতপক্ষে এবং পিতৃপক্ষে সকল কর্তব্য সাধন করিতে পারিলে, তবে দেবীপক্ষে মায়ের আরাধণা করিবার অধিকার হয়। পূর্বে বলিয়াছি—যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা নবম্যাদি কল্প করিয়া থাকেন, অর্থাৎ পিতৃপক্ষের নবমী তিথি হইতে তাঁহারা বোধন বসাইয়া থাকেন; তাঁহারা এক মাস কাল দেবীর পূজা করেন। নবম্যাদি কল্পকে সাক্ষী বোধন বলে, অর্থাৎ তিলাঞ্জলি-পরিতৃপ্ত পিতৃগণ উপস্থিত থাকিয়া এই কল্পের সহায়তা করেন; তাঁহারা যেন দাঁড়াইয়া থাকিয়া কুণ্ডলিনীজাগরণের সুবিধা করিয়া দেন। বংশানুক্রমের প্রভাবে (Heridity) এ দেহ ত তাঁহাদেরই, তাঁহাদের পাপ পুণ্য, দোষ গুণ এবং অন্য বিশিষ্টতা সকলই এ দেহে সূক্ষ্ম বা প্রকট ভাবে বিরাজ করিতেছে; তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া বোধনের সহায়তা করিলে মা আমার দেহঘটে এবং বিশ্বঘটে স্বেচ্ছায় জাগিয়া বসেন; তিনি জাগিলে আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়, আমার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মস্বরূপের দর্শন হয়। এই জাগরণই দুর্গোৎসবের সাধনা, আসল পূজা, আসল আরাধনা। এই জাগরণ দেহভাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ঘটে এবং পটে সাধন করিতে হয়। এই জাগরণই বোধন, এই জাগরণই আগমনী, এই জাগরণই প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা—দেবীর আগমন এবং নির্গমন। প্রতি বর্ষে পঞ্জিকাতে লেখা থাকে যে, এবার দেবীর দোলায়

আগমন বা নৌকায় আগমন, তাহা জাগরণের ভঙ্গীর ইঙ্গিত মাত্র। বাহ্য প্রকৃতির যেমন অবস্থা থাকিবে, দেহভাণ্ডে কুণ্ডলিনীর তেমনই ভাবে—তেমনই প্রকারের গতিতে জাগরণ বা উদ্বোধন হইবে। হস্তী, অশ্ব, নৌকা, দোলা প্রভৃতির গতির অনুরূপ গতিতে মায়ের উদ্বোধন হইলে, রূপকের ভাষায় পঞ্জিকাকারগণ তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

বোধন ও জাগরণ

বোধন দুই প্রকারের; প্রথম সাধনার বোধন, দ্বিতীয় উৎসবের বোধন। তন্ত্র বলেন যে, দেবনিদ্রাকালে বিল্ববৃক্ষমূলে শিব ও দুর্গা শয়ন করিয়া থাকেন; এই জন্য ঐ সময়ে বিল্বমূল খনন করিতে নাই। দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া এ কথাটা বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, পুরাণের ভাষায় বিল্ববৃক্ষ দেহের মেরুদণ্ডকেই বলা হইয়া থাকে। এই বিল্বমূলে—মূলাধারে কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা রহিয়াছেন; কাজেই তাঁহাকে জাগাইতে হইলে মূলাধারে, বিল্বমূলে যাইয়া তাঁহার বোধন করিতে হইবে। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ বুঝিতে না পারিলে, অন্ততঃ সে theory না জানিলে দুর্গোৎসবের প্রকরণ ও পদ্ধতি বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে। কারণ, তন্ত্রোক্ত সকল পূজা ও উপাসনার দুইটা দিক্ আছে, একটা ষট্‌চক্রভেদের—দেহতত্ত্বের দিক্, অন্যটা উৎসবের—ভাবের ও সমাজের দিক্। দেহতত্ত্বের অংশটা না বুঝিলে ভাবের দিকের ঠিক মজাটা পাওয়া যায় না। বোধন করিবার পূর্বে সঙ্কল্প করিতে হয়; সে সঙ্কল্পের মন্ত্রে আছে—

'আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুক-গোত্রঃ সদারাপত্যঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীভগবদ্দুর্গা-প্রীতিকামঃ প্রত্যহং বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাকর্মাহং করিষ্যে।'

এই সঙ্কল্পের মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীদুর্গাপূজা বার্ষিক পূজা—নিত্যকর্মতুল্য অবশ্যকর্তব্য পূজা; কারণ, গোড়ার সঙ্কল্পে কোন কামনার উল্লেখ নাই; এবং এই পূজা সদারাপত্য—স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেত সকলে মিলিয়া করিতে হয়। অধিবাসের সঙ্কল্প করিবার বচনে 'শ্বঃকর্তব্য-বার্ষিকশরৎকালীন' এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। কাজেই বলিতে হইবে, সামাজিক হিসাবে দুর্গোৎসব নিত্যকর্মতুল্য অবশ্যকর্তব্য। এইখানেই নবরাত্রের ব্রতের সহিত

দুর্গোৎসবের সমতা রক্ষিত হইয়াছে। বোধনের পূর্বে কুণ্ডলিনীকবচ পাঠ করিতে হয়। দেহের কোন্ অংশে তিনি কোন্ রূপে এবং কেমন ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহার বর্ণনা এই কবচে আছে। গৃহস্থ পূজক কেবল কুণ্ডলিনীকবচ পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করেন। সাধক যিনি, তিনি ঐ কবচের নির্দেশ অনুসারে ষট্চক্রে দেবীর ছয়টা রূপ ধ্যান করিয়া মূলাধারে যাইয়া তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। যে সিদ্ধ সাধক কুণ্ডলিনীকে উদ্বোধন করিতে পারেন, তাঁহার পূজা সিদ্ধ হয়, তিনি দেহমাতৃকাকে বিশ্বমাতা বিশ্বময়ীরূপে দেখিতে পান—বুঝিতে পারেন। তিনি মহানবমী পর্যন্ত মানস পূজায় মায়ের অর্চনা করিতে থাকেন। গৃহস্থ এই সাধনার অনুকল্প করে। তিনি বোধনের ঘট বিল্বমূলে বসাইয়া বলেন—'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ভগবদ্দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ।' পরে 'ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে ঘটস্থ এবং আসনস্থ করিতে হয়। এই সঙ্গে 'উভে যদিন্দ্ররোদসী আপপ্রাথ উষা ইব, মহান্তং ত্বা মহীনাং দেবী সম্রাজং চর্ষণীনাং' ইত্যাদি বেদসূক্ত পাঠ করিতে হয়। দুর্গোৎসবের মন্ত্রের মধ্যে প্রায় বারো আনা বেদোক্ত মন্ত্র ও ঋচের আবৃত্তি করিতে হয়, বাকী তন্ত্রের মন্ত্র এবং পুরাণের শ্লোক। বোধনের শেষে এই শ্লোকটার আবৃত্তি করিতে হয়—

'রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্থয়ি কৃতঃ পুরা॥

* * * *

দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি।
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথাসুখম্।'

ইহা ভাবের হিসাবে বলিতে হয়; কেহ কেহ গোড়ার অংশটুকু বলেন না। বোধনের পর অধিবাস; অধিবাসে দশ দিক্পাল, আদিত্যাদি নব গ্রহের এবং গণেশ, শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী আদি দেবতার অর্চনা করিতে হয়। শেষে 'মেরুমন্দার' আদি মন্ত্রের দ্বারা বিল্ববৃক্ষের আরাধনা করিয়া, নৈঋত কোণ ছাড়া অন্য দিকের ফলযুগলযুক্তা একটি শাখা কাটিয়া —'চণ্ডিকারোপণার্থায় ত্বামহং বরয়ে প্রভো' বলিয়া প্রতিমাসন্নিধানে রম্ভাতরু সহ নবপত্রিকার স্থাপন করিতে হয়। ইহাই কলা-বৌ; ইহাই আসল, ইহাই বোধনের আধার, দেবীর আবাহনের, ঘটস্থাপনের আশ্রয়। ইহা

কলাবধূ নহে, গণেশের পত্নীও নহে। দেহতত্ত্বের হিসাবে ইহাই মেরুদণ্ডের অনুকল্প ষট্‌চক্রভেদের নিদর্শন মাত্র। খোস্‌-খেয়ালের কাব্য জড়াইয়া এই মহামহোৎসবের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেই অজ্ঞতা এবং মূর্খতা আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। অনেকে এবম্প্রকারের উদ্ভট ব্যাখ্যা করিয়া দুর্গোৎসবের প্রকৃত মাহাত্ম্যের অপহ্নব ঘটাইয়াছেন। তাই এই প্রতিবাদটুকু এইখানে করিয়া রাখিতে হইল।

আগমনী

পূর্বে বলিয়াছি যে, দুর্গোৎসবে তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি আছে, পুরাণ আছে সমাজতত্ত্ব আছে। তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির একটু ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম, এই সঙ্গে আরও একটু বলিয়া রাখিতে হইবে। তন্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, দেহভাণ্ডে তাহাই আছে; বিশেষতঃ এই মেদিনীমণ্ডল—পৃথিবী সূক্ষ্মভাবে দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীতে কৈলাস, হিমালয়, সপ্ত সমুদ্র, অষ্ট কুলাচল আছে; দেহের ভিতরেও সেই সকলই আছে। দেহের কোন্ অংশ কৈলাস, কোন্ অংশ হিমালয়, তাহার নির্দেশ তন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। উমা, গৌরী, পার্বতী হিমালয়ের কন্যা; দেহের মধ্যের হিমালয়ে জাতা কুণ্ডলিনী পর্বে পর্বে ভবা, তাই তিনি পার্বতী। সেই পার্বতী কৈলাসে শিবের পার্শ্বে নিদ্রিতা, তাঁহাকে জাগাইয়া হিমালয়ে আনিয়া আত্মজা কন্যারূপে নবরাত্রের কয় দিন সাধক তাঁহাকে লইয়া মেয়ের সুখ ভোগ করিতে চাহেন। একাদশ আসক্তির মধ্যে বাৎসল্যাসক্তিকে প্রবল করিয়া ইষ্টদেবীকে কন্যারূপে তাঁহার সাযুজ্য ও সামীপ্য-সুখ অনুভব করিবার জন্যই দুর্গার পূজা ও বোধন। এই সাধনতত্ত্বটুকু পুরাণ এক সুন্দর কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন। পুরাণের এই ভাগবত উমামহেশ্বরের আখ্যায়িকা অবলম্বনে আগমনীর উৎপত্তি। আগমনী বোধনের—কুণ্ডলিনীর জাগরণের emotional অংশ বাৎসল্যাসক্তিমণ্ডিত মধুর গাথা। এই আগমনীর মধ্যে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি অতি সুন্দর ছবি ফুটান আছে; কি জামাইয়ের আদর, ঝিয়ের বাপের বাড়ীর প্রতি মমতার বোধ, মায়ের কন্যার প্রতি প্রবল স্নেহ—বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের ইহাই বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাকে পুরাণের গল্পের সহিত মিশাইয়া বাঙ্গালী কবিগণ এক অপূর্ব, অতুল্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেই অপূর্ব কাব্য—আগমনী। Emotional devotion যেন ঘোর কন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভিতরে রসতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব আছে ; পদে পদে, কথায় সে তত্ত্বের প্রতি সাধক কবিগণ ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন বটে, পরন্তু ভাবটা—কাব্যটা অতি জাঁকাল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ষট্‌চক্রভেদে, কুণ্ডলিনীর জাগরণে প্রথমে আসক্তি পুরুষকারকে সাধনায় তৎপর করে। আগমনীতেও সেই পদ্ধতি অবলম্বিত। আসক্তি মেনকা—জননী পার্শ্বের সম্মূঢ় পুরুষকে বলিতেছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।'

মা বলিতেছেন—ওগো, আমার মেয়ে বুঝি শ্বশুরবাড়ীতে কষ্টে আছে ; আজ রাত্রে স্বপ্নঘোরে তাহাকে দেখিয়াছি। যখন স্বপ্নে দেখা দিয়াছে, তখন নিশ্চয় সে আমাদের কথা ভাবিতেছে, এখানে আসিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। উঠ, উঠ,- জাগ, জাগ,—তোমারও ত কন্যা, কেবল আমার ত নহে, তাহাকে লইয়া আইস। অন্য পক্ষে কুণ্ডলিনী এই দেবনিদ্রার কালে বিদ্যুদ্বিকাশের মতন এক এক বার চমকিয়া উঠিতেছেন, অতএব সে চৈতন্য-রূপিণীকে এখন জাগাইলে তিনি জাগিবেন। পুরুষ তুমি, উদ্বোধনকার্যে প্রবৃত্ত হও। যখন বোধন সিদ্ধ হয়, তখন মাতৃশক্তির বিকাশ হয় ; উমার রূপের আলোতে দেহস্থ হিমালয়প্রদেশটা যেন কোটি বিদ্যুদ্দামে বিকশিত হইয়া উঠে,—তখন

"গা তোল গা তোল
বাঁধ মা কুন্তল
এল বুঝি তোর ঈশানী—
ও মা পাষাণী।"

যখন সাধনের ত্রুটিতে উদ্বোধনে বিলম্ব ঘটে, তখন বাৎসল্যসক্তি মেনকা অভিমান করিয়া বলেন,—

"এবার আমার উমা এলে
আর আমি পাঠাব না,
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ
কারু কথা শুন্‌ব না।

আমি শুনেছি নারদের মুখে
উমা আমার থাকে দুঃখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয়
উমা নেবার কথা কয়,
তখন—মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া,
জামাই বলে মানবো না।”

কি মধুর, কি সুন্দর, বাঙ্গালী জননীর কি অপূর্ব চিত্র! যখন সমাজ সজীব ছিল, পল্লীসমাজ অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন অপরপক্ষের গোড়া হইতে বাড়ী বাড়ী আগমনী গান হইত। এই আগমনী গানে বৈষ্ণব শাক্ত সবাই সমান ভাবে যোগ দিত। সে গান শুনিতে শুনিতে ভাবে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। আবার বিজয়ার দিন বিসর্জনের বিদায়ের গান শুনিলে দুঃখে কষ্টে প্রাণ ফাটিয়া যাইত। যেন সত্যই মনে হইত, ঘরের মেয়ে ঘরে আসিয়াছিল, নবমীর পরদিন পরের বাড়ী চলিয়া গেল। কাহারও বা রথের দিন হইতে, কাহাদেরও বা জন্মাষ্টমীর দিন হইতে দুর্গোৎসবের আড়ম্বর আরম্ভ হইত। যে দিন কাঠাম ধৌত করিয়া বাড়ীর কুলাঙ্গনাগণ শাঁখ বাজাইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া কাঠামতে 'সিন্দুর' লেপন করিতেন, এবং উদ্দেশে বলিতেন, 'এস মা, এবার ভালমুখে, হাসিমুখে এস মা; তোমার কল্যাণে আমাদের বাছাদের কল্যাণ হউক'— সেই দিন হইতে মায়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতাম, সেই দিন হইতে বাড়ীতে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইত, সেই দিন হইতে আগমনীর ঝঙ্কার কানে আসিয়া বাজিত। সমগ্র সমাজটাকে, সমগ্র দেশটাকে দুই মাস কাল এক ভাবে ভাবুক, এক রসে রসিক করিয়া রাখা হইত। গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য কবিগণ প্রতি বৎসর নূতন নূতন আগমনী গান রচনা করিতেন; বাঙ্গালা দেশে এমন লক্ষ লক্ষ আগমনী সঙ্গীত প্রতি বৎসরে রচিত হইত। সে একটা বিরাট্ literature হইয়া উঠিয়াছিল। অজ্ঞতার উপেক্ষায় আমরা তাহা হারাইয়াছি। দুই এক জন মহাকবি ও সিদ্ধ সাধকের ছিটে ফোঁটার মতন দুই চারিটা যে আগমনী গান এখনও প্রচলিত আছে, তাহার সৌন্দর্য্যে এবং রসমাধুর্য্যে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। অকালবোধন বলিয়া, নিদ্রিতা শক্তিকে জাগাইতে হয় বলিয়া, শারদোৎসবে আগমনীর এতটা বাহার, এমন অপূর্ব

প্রভাব। বাসন্তীপূজায়—চৈত্র মাসের দুর্গোৎসবে আগমনী নাই বলিলেও হয়; কারণ, তখন যে জাগ্রতা মায়ের পূজা, বোধনে তেমন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। কারণ, তখনকার মাতা হৈমবতী নহেন, দক্ষসুতা—সপ্তবিংশ-ত্রিনয়নী, দাক্ষায়ণী।

প্রতিমার কথা

দুর্গাপ্রতিমার সহিত দুর্গা আরাধনা এবং পূজার খুব অল্প সম্বন্ধ। এক সিংহবাহিনী মূর্তিরই যে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ঐ সিংহবাহিনী প্রতিমার ভিতরে সহস্র বৎসরের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। সিংহবাহিনী মূর্তি চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা, এবং অষ্টাদশভুজা হয় বাঙ্গালী দশভুজা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এখনও অষ্টাদশ-ভুজা প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করে নাই। পূর্বে সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্তিতে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, কিছুই থাকিত না। কেবল মায়ের মূর্তি, আর মহিষাসুরের বধ। সে সিংহবাহিনীর সিংহ আর এক রকমের ছিল, এখনকার African lion এর নকল ছিল না। সে অলৌকিক সিংহ, ঘাড় খুব লম্বা, মুখখানা কতকটা ঘোড়ার মতন, কতকটা মকরের মতন, শাদা, রোগা, টানা ও লম্বা, এক অপূর্ব জানোয়ার। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন এক সিংহবাহিনীর মূর্তি আছে। তাহার চিত্র সহ বর্ণনা গত বৎসরের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। হাজার বৎসরের পূর্বেকার বাঙ্গালী এবং এখনকার বাঙ্গালীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ, তাই এখনকার সিংহবাহিনী এবং তখনকার সিংহবাহিনীতে, আকাশ পাতালের পার্থক্য ঘটিয়াছে। এমূর্তি যে বাঙ্গালা দেশে কবে হইতে প্রচলিত হইল, তাহাও ভাবিয়া পাই না। কোন মূর্তিই তন্ত্রোক্ত ধ্যানের সহিত মিলান নহে। অমন টেড়িকাটা, তাজপরা বাবু কার্তিক পুরাণ তন্ত্রের কোন পৃষ্ঠায় নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর অমন রূপ ত কোথাও দেখিতে পাই না, তন্ত্রের ধ্যানে নাই, পুরাণের স্তব স্তোত্রে নাই। তাহার পর যে ভাবে মহিষাসুর মর্দন হইতেছে, সে ভাবটাও—সে ভঙ্গীটাও পুরাণ ও তন্ত্রের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাইবে না। তাহার পর চালচিত্র বা সূর্য্যমুখ-ছটা যাহা পিছনে থাকে, তাহারও বিন্যাস এক অপূর্ব পদ্ধতিতে করা হইয়াছে। প্রবাদ এই যে,

ভাদুরিয়ার জমিদার প্রথমে প্রতিমা গড়িয়া দুর্গোৎসব করেন। সে আজ আট নয় শত বৎসরের কথা। পূর্বে বাঙ্গালায়, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মত ঘট স্থাপন করিয়া, যন্ত্রের উপর হোম করিয়া নবরাত্রের উৎসব হইত। সে উৎসব হিন্দু মাত্রকেই করিতে হইত। তাহার পর এই প্রকারের প্রতিমা গড়াইয়া কবে হইতে যে এত ধুমধামের সহিত পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্ধারিতভাবে বলিতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দুর্গোৎসবের কথা আছে, দশভুজা মূর্ত্তির, এমন আধুনিক প্রতিমার মহামহোৎসব সহ পূজার বর্ণনা নাই। শ্রীচৈতন্যের সময়ে যে দুর্গোৎসব হইত, তাহার অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু ঠিক আধুনিক ভাবের পূজা হইত কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তেমন পরিষ্কার বর্ণনা কোন গ্রন্থ বা পুথিতে পাওয়া যায় না। আশ্বিনে অম্বিকাপূজা—সে কি কেবল ঘট স্থাপনা করিয়া, চণ্ডীর পূজার মতন পূজা ছিল? নবরাত্রের উৎসব ছিল? না, এখনকার মত পূজা ছিল? আমি যত দূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এইটুকু জোর করিয়া বলিতে পারি যে, মাটির প্রতিমা গড়িয়া আধুনিক পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব আড়াই শত বৎসরের অধিক পুরাতন উৎসব নহে। সে প্রতিমাও এখনকার অনুরূপ প্রতিমা নহে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে আধুনিক পদ্ধতিটা একটু প্রবল হইয়াছে; ইংরেজের আমল হইতে এই উৎসব ও পূজা প্রকটভাবে সমাজে চলিয়াছে। এখনকার প্রতিমার প্রতি অভিনিবেশপূর্বক চাহিয়া দেখিলে উহাতে ইংরেজী সভ্যতার চিহ্ন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আধুনিক দুর্গাপ্রতিমার পুরাতন ইতিহাস এবং পর্য্যায়ক্রমে উন্মেষপদ্ধতি অনুসন্ধানযোগ্য; উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে পারিলে বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ও ধর্ম্মগত ইতিহাসের একটা অঙ্গ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ভাবের দিকটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা; সমাজের সকলকে লইয়া সম্মিলিত ভাবে উৎসব করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। নবপত্রিকা-প্রবেশের সময়ে বলিতে হয়—

'ওঁ চণ্ডিকে চল চল, চালয় চালয়, শীঘ্রং ত্বমম্বিকে পূজালয়ং প্রবিশ।** ত্বং পরা পরমা শক্তিস্ত্বমেব শিববল্লভা। ত্রৈলোক্যোদ্ধারহেতুস্ত্বমবতীর্ণা যুগে যুগে॥'

দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতিমতেও—'ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ

সহ। * * * বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ যজ্ঞে সুরেশ্বরি॥ দেবি ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী। পত্রিকাসু সমস্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥'

এই সব মন্ত্রে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক গণেশের নাম মাত্র নাই; উহাদের বোধনও নাই। তবে উহাদের অর্চনা করিতে হয়, এক একটা পাদ্যার্ঘ দিয়া উহাদের সম্বর্ধনা করিতে হয়। গণপতির পূজা না হইলে কোন পূজাই হয় না, সেই হিসাবে গণেশের পূজা হয়—গণেশের প্রতিমূর্তির নহে। চণ্ডিকা সকল আয়ুধসম্পন্না, তাই আয়ুধগণের পূজা করিতে হয়;—সেটা শক্তিপূজার অঙ্গস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তাহাই অস্ত্রপূজা, শক্তি আরাধনার প্রতীক অর্চনা মাত্র। আসল কথা এই যে, যে প্রতিমা গড়া থাকে, তাহার যখন ধ্যান করিতে হয় না, তখন তাহা প্রকৃতপক্ষে উপাস্য নহে। প্রতিমাটা পৌরাণিক ও সামাজিক অংশের অঙ্গীভূত; উহার সাহায্যে ভাব ফুটে, উহার সাহায্য সমাজে সম্মেলন সম্ভবপর হয়, উহা সর্বজনীন উৎসবের সহায়, তাই উহার প্রতিষ্ঠা। এখনও অনেক গৃহস্থ নিজের খেয়ালের মত প্রতিমা গড়িয়া থাকে; সকল বাড়ীর সকল প্রতিমা একরকমের নহে; অনেকে সিংহবাহিনীই গড়েন না, কেবল উমামহেশ্বর গড়িয়া দুর্গোৎসব করেন। এখন ত দুর্গোৎসব ঢের কমিয়াছে, তথাপি বিজয়ার দিন কলকাতার ঘাটে ঘাটে বেড়াইলে কত রকমের কত মজার প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রতিমা আরাধ্য নহে; উহা ঘরসাজান সামগ্রী।

ভাব ও ভক্তি

বলিয়াছি যে, দুর্গোৎসবের ভাবাংশটুকু অতিই মধুর, অতীব সুন্দর। আত্মজা—আত্মশক্তিময়ী—কুণ্ডলিনী ভদ্রকালী, কাজেই তিনি মেয়ের মতন—মেয়ে ত বটেনই। আত্মজ ও আত্মজা যেমন জনকের জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর, বেদ, শাখা পাইয়া থাকে, পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হইয়া থাকে, আত্মজা উমাও তেমনি যাহার বাড়ীতে, যাহার ঘটে উদ্বুদ্ধা হইয়া নবরাত্র যাপন করেন, তাহারই জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর লাভ করেন। তিনি তাহার কন্যারূপে বিরাজ করেন। তন্ত্রের ইহা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। ইহার মধ্যে অনেক কথা লুকান আছে, তাহা পরে বলিব। তাই কায়স্থের বাড়ীর দেবতাকে

ব্রাহ্মণে নমস্কার করে না. শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ব্রাহ্মণে করে না।* তবে শিব না কি ব্রাহ্মণ, তাঁহার সঙ্গিনী শিবানী ব্রাহ্মণী বটেন; সেই জন্ত কায়স্থ পূজক মাকে অন্নভোগ দেয় না, জামাইয়ের জাতি মারা যাইবার আশঙ্কায়। কিন্তু যাহারা সিদ্ধ সাধক, তাহারা শিবের ভাবনা ভাবে না, কন্যারূপে মাকে গৃহে আনিয়া কন্যার মতনই তাহার সহিত ব্যবহার করে; নিজে যাহা খায়, যাহা ভালবাসে, তাহারই ভোগ চড়ায়। আত্মতুষ্টি যাহাতে, আত্মজা উমার তুষ্টি তাহাতেই। এই কন্যাভাবের কথা লইয়া শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একটি সুন্দর গীত রচনা করিয়াছিলেন—

"মেয়ের বিয়ে দিতে বড় বাসনা,
সকল যোগাড় আছে আমার
মেয়ে কিন্তু হ'ল না।"

আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে কন্যারূপে জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে তিনি ত কন্যারূপে দেখা দেন না, কাজেই মেয়ে হয় না। শক্তিসাধনা ভাবের ও ভক্তির সাধনা, রসের এবং প্রেমের নহে। ভক্তির এমন বিকাশ আর কোন জাতির মধ্যে হইয়াছিল কি না, বলা যায় না; আদ্যাশক্তিকে মা বলিয়া, মেয়ে বলিয়া ভক্তির এমন কোন জাতির কোন সাহিত্যে হয় নাই। বাঙ্গালী যেমন গালভরা, বুকপোরা মা নামে ডাকিয়া থাকে, আব্রহ্ম তৃণস্তম্ভ পর্যন্ত সকলকে মা বলিয়া মাধুরীমণ্ডিত করিয়া লয়; এমনটি—এমন মাতৃভাবের অভিব্যক্তি আর কোন জাতি করিতে পারে নাই। মায়ের ঘর-সংসার পাতাইয়া মায়ের ছেলে হইয়া কেমন করিয়া থাকিতে হয়, তাহা বাঙ্গালীই শিখিয়াছিল, বাঙ্গালীই পারিয়াছিল। এই ভাব ও ভক্তি ফুটাইবার জন্য পুরাণসকলের সৃষ্টি, এই ভাব ও ভক্তির পুষ্টির জন্য এক কালে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নিত্য চণ্ডীপাঠ হইত; এই ভাব ও ভক্তিকে আচণ্ডালে বিলাইবার জন্য মুকুন্দরাম হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাঙ্গালার মহাকবিগণ মহাকাব্যসকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে ভাব ও ভক্তি হারাইয়াছি, তাই সে সব কথা আমরা আর তেমন করিয়া বুঝিতে পারি না; বুঝাইবার জন্য এতটা প্রয়াস পাইতে হয়। কিন্তু তাহা ত বুঝাইবার নহে। যে মায়ের স্নেহ পায় নাই, কন্যাকে আদর করে নাই, সে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব কেমন করিয়া বুঝিবে! বাঙ্গালার

* এ কথাটা কলিকাতা অঞ্চলের কথা। আমরা জানি, পূর্বাঙ্গের অনেক স্থানে দেবদেবী-পূজায় এ জাতিভেদ নাই।—নারায়ণ-সং।

মায়ের স্নেহ বুঝা চাই, প্রাণে প্রাণে অনুভব করা চাই, বাঙ্গালীর গৃহের কুমারী কন্যার আদর সোহাগ বুঝা চাই, যত্ন আবদার জানা চাই, তবে ইষ্টদেবতার উপর সেই ভাবের আরোপের মহিমা বুঝিতে পারিবে। যিনি জগন্ময়ী, আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী, যিনি—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

তাঁহাকে মায়ের আসনে বসাইয়া, অথবা মেয়ের সাজে সাজাইয়া আদর সোহাগ করিলে কত মিষ্ট হয়, কত মধুর হয়, জীবনটা কি মজার সুখে ও আনন্দে পূর্ণ হয়, তাহা যে ভাবারোপের পদ্ধতি জানে না, তাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব! ভাবারোপ ভক্তিসাধনার একটা অপূর্ব পদ্ধতি। শ্রীভগবানকে প্রভু, রাজা, দণ্ডধর, পিতা বলিয়া উপাসনা করিলে তেমন মজা পাওয়া যায় না; সে যেন একটু দূরে দূরে, ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। পরন্তু তিনি জননী— মা, তাঁহার কাছে কোন কিছু গোপন করিবার নাই। সকল আবদার, সকল আদর তাঁহার কাছে করিতে পারিব—ইহা কতটা মধুর, কত মোলায়েম, কতই মিষ্ট! আবার ছোটখাট মেয়েটি হইলে, তাহাকে মা বলিয়া ত ডাকাই চলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঘাড়ে পিঠে কর, আদর সোহাগ কর, আমোদ আহ্লাদ কর—সে আরও মধুর, আরও সুন্দর, আরও কোমল। বাঙ্গালী এক কালে জগদম্বাকে একাধারে মা ও মেয়ে সাজাইয়া মানবজন্ম ধন্য করিয়াছিল, দুঃখের জীবনকে সুখময়, স্নেহময়, মধুময়, মোহময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই মোহময় জীবন ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর শ্যামাবিষয়ক গান অপূর্ব, অতুল্য, অসাধারণ এবং অদ্ভুত। এই শ্যামাবিষয়ক গানের পথে ভাবের একটা দিক্ পদ্মার ভাদ্রের স্রোতের মতন দুই কূল উপ্‌চাইয়া প্রবল তরঙ্গে বহিয়া গিয়াছে।

জাঁকের পূজা

এইবার পূজার বিবরণ একটু দিব। বোধন কতকটা গোপনে, বিল্ববৃক্ষমূলে করিতে হয়; সপ্তমী হইতে নবমীপূজাটা বেজায় জাঁকের, বেজায় প্রকাশ্যভাবে করিতে হয়। নানা বাদ্যভাণ্ড সহ পূজা করিতে হয়, পরন্তু বংশীরব সহ মায়ের পূজা করিতে নাই, রসবিপর্যয় ঘটে। যাঁহারা ভাল গৃহস্থ, যাঁহারা তন্ত্রের নির্দেশ মানিয়া দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন, তাঁহারা তুরী ভেরী

শঙ্খনাদ সহ, কাড়া নাগড়া, ঢাক ঢোল সহ পূজা করিবেন, কিন্তু কখনই পূজাগৃহে বংশীরব করিতে দিবেন না। মা আমার ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, তিনি জগৎপ্রসূতি, জগৎসবিত্রী ; তাঁহার সম্মুখে বংশীরব করিলে রসবিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা, তাই দুর্গোৎসবে বংশীরব নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ দুর্গোৎসব সাময়িক পূজা,—রণচণ্ডীর পূজা, সুতরাং এ পূজায় সমরসময়োপযোগী বাদ্যভাণ্ড ব্যবহার করিতে হয়।

দুর্গোৎসবের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ স্নান ; প্রথমে নবপত্রিকার স্নান, তাহার পর দেবীর স্নান। তাহাকে মহাস্নান বলে। সে স্নান তিন প্রস্থে তিন ভাবে করিতে হয়। প্রথমে সর্বতীর্থের জলে স্নান করাইতে হয়—

"আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥"

এই ভাবে মন্ত্র পড়িয়া ভারতবর্ষের যত নদ নদী, হ্রদ, সাগর, তড়াগ, পল্বল, সর্বতীর্থের নাম করিয়া ভৃঙ্গারে তাহাদের আবাহন করিতে হয়। তাহার পর বৃষ্টির জল, শিশিরসঞ্চিত জল, উষ্ণ প্রস্রবণের জল, গন্ধোদক, শঙ্খোদক, গঙ্গোদক এবং শুদ্ধ জলে দেবীর স্নান করাইতে হয়। স্নানের সময়ে 'ওঁ আপো হিষ্ঠা' মূলক বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ; 'ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং' মন্ত্রেরও আবৃত্তি করিতে হয়। শেষে সাগরজলে আসন শোধণ করিয়া লইতে হয়। আজকাল আর মহাস্নানের ঠিকমত ব্যবস্থা হয় না, পুরোহিত মহাশয় প্রায়ই অনুকল্পে কাজ সারিয়া লন। পঞ্চ গব্যে শোধনটাও ভাল করিয়া হয় না। তাহার পর পঞ্চ শস্যের জলে, রজতের জলে, স্বর্ণোদকে, মুক্তার জলে, নারিকেল-জলে, সর্বৌষধি ও মহৌষধির জলে, চন্দনজলে স্নান করাইতে হয়। পুরাণে দুর্গোৎসবের যে পদ্ধতির নির্দেশ আছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে হইলে সম্রাট্ অথবা অতিবড় ধনী ছাড়া আর কেহ যথারীতি দুর্গোৎসব করিতে পারে না। প্রবাদ এই, কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ রহিত হওয়াতে এই দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে ; দুর্গোৎসব কলিযুগে অশ্বমেধের অনুকল্পস্বরূপ। সুতরাং রাজা মহারাজা, ধনকুবের ছাড়া আর কেহ ঠিকমত দুর্গোৎসব করিতে পারে না। তবে তন্ত্রোক্ত শক্তির আরাধনা সাধক মাত্রেরই আয়ত্তের মধ্যে আছে। স্নানের পূর্বে গজদন্ত-মৃত্তিকায়, বরাহদন্ত-মৃত্তিকায়, বৃষশৃঙ্গ-মৃত্তিকায়,

বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকায়, সাগরতল-মৃত্তিকায়, গঙ্গার দুই কূলের মৃত্তিকায় দেবীপীঠ বা ঘটকে পবিত্র করিয়া লইতে হয়। যে দেশে স্বচ্ছন্দে বন্য বরাহ, মত্ত মাতঙ্গ, বন্য বৃষ বিচরণ করে না, যে দেশে অজগরের গর্তের মাটি পাওয়া যায় না, সে দেশে এই সকল শুদ্ধিমৃত্তিকা সংগ্রহ করাই কঠিন। অনন্তর অষ্টকলসজলে মহাস্নান শেষ করিতে হইবে; সে অষ্ট কলসে গঙ্গার জল, বৃষ্টির জল, সরস্বতী-সলিল, সাগরজল, পদ্মরেণুসমন্বিত জল, নির্ঝরজল, সর্বতীর্থজল ও চন্দন-জল—এই অষ্ট প্রকারের জল পূর্ণ থাকিবে। নবপত্রিকার এবং দেবীর যন্ত্রের স্নান ত করাইবেই, যে সাধক মায়ের বোধন করিয়াছেন, তাঁহার দেহঘটে ও বাহিরের ঘটে মাতৃশক্তির বিকাশ হইয়াছে, এই বিবেচনায় তাঁহাকেও স্নান করাইতে হইবে। পূর্ণাঙ্গে তিন বার স্নান ও শুদ্ধি হইলে তবে মায়ের সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত পূজা চলিবে। স্নানের পর গন্ধানুলেপ,—সেও এক অপূর্ব ব্যাপার। চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরি—প্রসাধন-কলায় যাহা যাহা গন্ধদ্রব্য বলিয়া পরিচিত, সে সবই একটু একটু করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। বাহিরে এই ভাবে স্নান করাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে মানস পূজায় মনে মনে সেই স্নানের অভিনয়টি করিতে হইবে। ভাবিতে হইবে—মেয়েটি আমার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছে, আমি স্বয়ং তাহার গাত্রমার্জন করিয়া, তৈলাদি লেপন করিয়া, তাহাকে স্নান করাইতেছি। পুরাণে যে ক্রম লেখা আছে, ঠিক সেই ক্রম অনুসারে তাঁহার স্নান করাইতে হইবে। চঞ্চলা চপলা মেয়ে মাঝে মাঝে পিঁড়ি হইতে উঠিয়া পলাইতে চাহিবে, তুমি তাহাকে ধরিয়া আদর করিয়া যেন বসাইবে, তোমার আদর যত্ন শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে আবার আসিয়া বসিবেন, তুমি মহাস্নান কার্য্য নিরাপদে শেষ করিবে। তাহার পর মেয়েটিকে কাপড় পরাইয়া দিবে, গন্ধদ্রব্যের দ্বারা তাঁহার দেহের অঙ্গরাগ বর্দ্ধিত করিবে, শেষে নানা মণিমুক্তার মহামূল্যবান্ অলঙ্কার পরাইয়া মেয়েটিকে রাজরাজেশ্বরীরূপে সাজাইয়া বেদীর উপর বসাইবে। বেদীর উপর বসাইবার সময়ে মনে হইবে, তোমার সত্তস্নাতা কন্যা উমা সিংহবাহিনী প্রতিমার সঙ্গে যেন এক হইয়া গেলেন। ইহাই মানস পূজার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। এইটুকু না হইলে চণ্ডীমণ্ডপে দেবভাব পূর্ণ হয় না।

স্নানের পর ভূতশুদ্ধি এবং ভূতাপসরণ-মন্ত্র পাঠ করিয়া সকল দিক্ পবিত্র ও সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া লইতে হয়। তাহার পর মাকে কিসের জন্য ডাকিতেছি, তাহা মন খুলিয়া বলিতে হয়।

'আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেহপি চ।
কৈলাসশিখরাদ্দেবি বিন্ধ্যাদ্রেহিমপর্বতাৎ।
আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্॥

এই ভাবে নবপত্রিকার পূজা, ঘটে ও যন্ত্রে মায়ের বোধন শেষ করিয়া, শেষে মহিষাসুরাদি প্রতিমাস্থ দেবতার সামান্য অর্চনা করিতে হয়। তাহার পর বাসুদেব, নীলকণ্ঠ, দশাবতার, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, চতুর্বেদ প্রভৃতি সকল দেব, সকল দেবীর রীতিমত অর্চনা করিতে হয়। শেষে অস্ত্রসকলের পূজা করিতে হয়। যুদ্ধে যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, প্রতিমার দশ হস্তে যে সকল অস্ত্র থাকে, সে সকলের পূজা করিতে হয়। পূজা অর্চনা পরিসমাপ্ত করিলে হোম করিতে হয়, যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া হোম করিতে হয়। এই হোমে বৈদিক এবং তান্ত্রিক দুই প্রকারের মন্ত্র এবং পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। নিয়মিত আদ্যাশক্তির বৈদিক হোম করিতে হইলে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এখন তেমন জোগাড় হয় না, বাঙ্গালার পুরোহিতগণ সে হোম ঠিকমত করিতে পারেন না। তাই হোমটা অনুকল্পে সাধিত হয়। অথচ হোমই হইল আসল পূজা। স্নান, অভিষেক, পূজা—এ সকলই বহিরঙ্গ, ভাবপুষ্টির এবং ভাবোন্মেষের একটা উপায় মাত্র; হোমই হইল যজ্ঞ, হোমই হইল কর্ম। বাহ্যিক হোম করিয়া মানস হোম করিতে হয়; মানস হোমের বর্ণনা তন্ত্রে সবিস্তার লিখিত আছে। প্রবাদ আছে যে, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের মধ্যে চারি পাঁচ বার পূর্ণাঙ্গে দুর্গোৎসবের হোম করিতে পারিয়াছিলেন। এখন বুঝা গেল যে, দুর্গোৎসবের তিনটি প্রধান অঙ্গ;—প্রথম বিল্বমূলে বোধন, দ্বিতীয় বিল্বশাখা ও কদলীবৃক্ষ সহ দেহস্থ কুণ্ডলিনীর অনুকল্পে কুণ্ডলিনীর প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় হোম। এই তিন অঙ্গ বাহ্যিক ভাবে ফুটাইতে হইবে, আবার মানস ক্ষেত্রে ভাবের বিকাশ করিয়া মনে মনে তাহার অনুবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাই ভদ্রকালীর আরাধনা; বাকী যাহা কিছু, তাহা উৎসবের অঙ্গ। এই ভাবে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পূজা করিতে হয়; মহাষ্টমী এবং মহানবমীতে মন্ত্রের বচনের একটু পার্থক্য আছে, তাহার জন্য মূল পূজাপদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তবে সন্ধিপূজায় একটু মজা আছে। বোধনের পর জাগরিতা কুণ্ডলিনীর উপচয় ঘটে, মা জাগিয়া উঠিয়া হৃদয় জুড়িয়া এবং দালান জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, সন্ধিপূজার সময় হইতে সে বিকশিত শক্তির অপচয় আরম্ভ

হয়, সন্ধিপূজার পর হইতে বিজয়ার সূত্রপাত হয়। তাই সন্ধিপূজা মজার পূজা; উহা বাহ্যিকও বটে, মানসও বটে। বাহিরে যেমন এক শত আটটা দীপ জ্বালিয়া পূজা ও আরতি করিতে হয়, মনোময়ী চিন্ময়ী দেবীকে তেমনি ষড়্‌রিপু, একাদশ আসক্তি, চতুঃষষ্টি রস এবং সাতাইশটা ভাব জ্বালিয়া হৃদয়মন্দিরকে সাজাইতে হয় এবং গমনোন্মত্তা দেবীকে পূজা অর্চনা এবং আরতি করিতে হয়। বিজয়ার কথাটা এখন আর বলিব না, বলিতে নাই বলিয়া বলিব না; পরে কখনও উহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। দুর্গোৎসবে যেমন বাহ্যিক ধুমধাম আছে, তেমনই প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা আছে, আর পুরাণের হিসাবে ভাব ও রস আছে। দুর্গোৎসবের সঙ্গে বাঙ্গালীত্ব—বাঙ্গালার হিন্দুর বিশিষ্টতা যেন জড়ান মাখান আছে।

বলিদান ও দয়াধর্ম

বলিদানের তত্ত্বটা আমাদের সমাজের মধ্যে অনেকেই ঠিক ভাবে বুঝেন না, সবাই আংশিক ভাবে উহার আলোচনা করিয়া থাকেন। যে তিনটা পুরাণের পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কালিকাপুরাণেই বলির একটু জাঁকজমক আছে, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণেও মাষকলাই বলির অনুকল্প করা হইয়াছে; দেবীপুরাণেও বলির প্রাধান্য তেমন দেওয়া হয় নাই। মহানির্বাণতন্ত্রে স্পষ্টই লেখা আছে যে, ষড়্‌রিপুকেই মায়ের দুয়ারে বলি দিতে হয়, সকল আসক্তির পুষ্প লইয়া পূজা করিতে হয়। অথচ সেই মহানির্বাণতন্ত্রে পঞ্চ তত্ত্বের কথা লইয়া নানা মাংসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, মৎস্যের ব্যবহারও করিতে বলা হইয়াছে। যেখানে আরাধনা, যেখানে ষট্‌চক্রভেদ, সেখানে বলিদান নাই—মেষ, ছাগ, মহিষের বধকার্য নাই; কিন্তু সেখানে যজ্ঞ, যেখানে সামাজিক উৎসবের কাজ, সেখানে বলিদান আছে, ভোগরাগ আছে, প্রসাদ-বিতরণ আছে, উৎসব আনন্দ আছে। সমাজের সকলেই কিন্তু আর শাক পাতা খাইয়াই থাকিতে পারে না, সমাজের মধ্যে মাংসাশী থাকিবেই, ভাল খাইবার, ভাল পরিবার লোক থাকিবেই। তাহাদের বাদ দিলে ত চলিবে না, সকলকে লইয়া উৎসব আনন্দে মাতিতে হইবে, কাজেই সকলের রুচি অনুসারে কাজ করিতেই হয়। তাহার পর তন্ত্রে একটা বড় কথা আছে। তন্ত্র বলেন, তোমার আত্মাই যখন তোমার ইষ্টদেবী, তখন

সেই আত্মার তুষ্টি পুষ্টির জন্য যাহা কিছু ভোগরাগের প্রয়োজন হইবে, তাহা দেবতাকে দিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু, জাতিগত বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া, সামাজিক বিধিনিষেধ মানিয়া যে সকল খাদ্য খাইতে পারে, যে সকল ভোজ্য উপভোগ করিতে পারে, তাহাই কুণ্ডলিনী দেবীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ খাইবে। তুমি তৃপ্তির সহিত যাহা খাও, তাহাই মাকে ভোগ চড়াইতে পার। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের সম্মুখে তাই সাঁওতাল ও কোলগণ মুর্গী বলিদান দিয়া থাকে। আমি যাহা খাইব, তাহা দেবীর প্রসাদ করিয়া লইয়া খাইবার উদ্দেশ্যেই বলি দিয়া থাকি। তুমি যেমন, তোমার ইষ্টদেবতাও তেমনি হইবে; তোমার প্রবৃত্তি অনুসারে তোমার দেবতার রুচি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যে দেবী তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর গ্রহণ করেন, সে দেবী তোমার আচার ব্যবহার, ভক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিবেন না কেন? যদি বল, দেবতাকে মাংসভোগ দিতে ইচ্ছা করে না, তাহা যদি সত্য হয়, morbid sentimentalism না হয়, তাহা হইলে তোমারও মাংসভোজন পরিহার করিতেই হইবে। না করিলে তোমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটিবে। এই ত গেল বাহিরের ভাবের কথা। ইহা ছাড়া বলিদানতত্ত্বের ভিতরে একটা গুপ্ত কথা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও সে কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তন্ত্র বলেন, দেহস্থ আত্মা উষ্ণ শোণিতের দ্বারা সঞ্জীবিত থাকেন; শোণিত ঠাণ্ডা হইলে আত্মাকেও দেহত্যাগ করিতে হয়, অতএব উষ্ণ শোণিত আত্মার খাদ্য, যাহার সাহায্যে শোণিতের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, তাহাই আত্মার খাদ্য। সুতরাং আত্মাকে ভোগ দিতে হইলে উষ্ণ শোণিতই প্রশস্ত ভোগ। এই সঙ্গে তন্ত্র বলেন, তোমরা যে দয়াপরবশ হইয়া ছাগবধ করিতে বাধা দেও—কেন? বৎসকে বঞ্চিত রাখিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ অপহরণ করা নির্দয়তা নহে? দুগ্ধের পায়স পিষ্টক রচনা করিয়া দেবতাকে ভোগ দিলে তাহা দোষের হয় না? বৃক্ষ লতা গুল্ম সবাই সজীব, সকলেরই বেদনাবোধ আছে। বৃক্ষের ফুল ছিঁড়িয়া, ফল ছিঁড়িয়া দেবতাকে উপঢৌকন দেও যে, তাহাতে নির্দয়তা প্রকাশ পায় না? সেটা কি জীবহত্যা নহে? আব্রহ্ম তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সর্বদে ও সর্বত্র জীবনদায়িনী কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা অণুতে আছেন, পর্বতেও আছেন। গোধূম, যব, ধান্য প্রভৃতি যাহা গুঁড়া করিয়া, সিদ্ধ করিয়া খাও—তাহা মাটিতে পুঁতিলেই গাছ হইবে; অতএব বুঝিতে হইবে, সে সকলে প্রাণ আছে; তাহাদের প্রাণশক্তি সম্মুচ

করিয়া নানা খাদ্য দ্রব্য তৈয়ার করিয়া দেবতার ভোগ দিলে কোন দোষের হয় না; কেন না, বৃক্ষ লতা গুল্ম, গোধূম ব্রীহি ধান্য প্রভৃতি শস্যসকল ত পাঁঠার মতন চেঁচাইতে জানে না, তোমাদের করুণা ও অনুকম্পা আকর্ষণ করিতে পারে না, তাই অন্নভোগ দোষের নহে, তাহা নিরামিষ ও পবিত্র, আর পাঁঠা ও মাছ মারিয়া ভোগ দিলেই যত দোষ! তন্ত্র এই দয়াধর্মের, এই ঘাস খাওয়ার গোঁড়ামির বেজায় নিন্দা করিয়াছেন। যে যাহা খাইয়া তৃপ্তি বোধ করে, পুষ্টি লাভ করে, তাহার নিন্দা করার অধিকার তোমার নাই। তোমার পক্ষে যাহা ভাল, যাহা উপযোগী, তাহা অন্যের পক্ষে ভাল বা উপযোগী না হইতে পারে। এইটুকু বলিয়া তন্ত্র একটা বড় কথা বলিয়াছেন।

তন্ত্র বলেন—হিংসা হইতেই সৃষ্টি; হিংসা ছাড়া সৃষ্টি হইতেই পারে না। স্থাবর জঙ্গম—সৃষ্টির যে দিকে তাকাও, সেই দিকেই হিংসার বিকাশ। Biologyর হিসাবে কথাটা সত্য, তন্ত্রের হিসাবেও কথাটা সত্য। এই হিংসা শব্দ হইতে সিংহ শব্দের উদ্ভব। যেখানে দেহ, যেখানে দেহী, যেখানে শক্তির বিকাশ এবং বিভূতির অভিব্যঞ্জনা, সেইখানেই হিংসা,—সেইখানেই এক অপরকে চাপিয়া রাখিতে চাহে, দুর্বল জীবদেহের দ্বারা প্রবল জীব পুষ্ট হইয়া থাকিতে চাহে—সেইখানেই, দেহে দেহে, স্থূলে সূক্ষ্মে, জীবে জীবে, ঘটে ঘটে, হিংসা সিংহরূপে বিদ্যমান, আর দেবী কুলকুণ্ডলিনী সিংহবাহিনীরূপে সিংহরূপী হিংসাকে বশে আনিয়া সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন। এই সিংহবাহিনী মায়ের কোলে যাইতে পারিলে, মায়ের ছেলে হইতে পারিলে, নগ্ন দিগম্বররূপে মাতার চরণে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিলে, তবে তেমন সাধক, তেমন মায়ের ছেলে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করিতে পারে। নহিলে পাঁঠা ছাড়িয়া কেবল ঘাস খাইলে অহিংসার পুষ্টি হয় না; মশা ছারপোকা না মারিয়া সামাজিক মনুষ্যের সর্বনাশ সাধন করিলে অহিংসার উপচয় ঘটে না। যে ষট্‌চক্রভেদ করিতে পারিয়াছে, যে ইষ্টদেবীকে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারিয়াছে, যাহার নিজের বলিবার কিছু নাই, যে মা ছাড়া কিছু জানে না, জগৎ সংসার মা-ময় দেখে, সেই অহিংসা পরম ধর্ম, এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। তন্ত্র বলেন, মানুষকে যেমন পাইবে, তাহাকে তেমনই ভাবে লইবে, পরে ধীরে ধীরে সাধনার বকযন্ত্রে তাহাকে চোলাই করিয়া তাহার দেহস্থ আত্মশক্তি—

মনুষ্যত্বের সারকে বাহির করিয়া মাতৃপদে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত মিশাইয়া দিবে। প্রবৃত্তিমার্গের উপাসনায় মানুষ যেমন, তাহার উপাসনা-পদ্ধতি তেমনই হইবে। যাহার যাহাতে অধিকার, সে তাহা লইয়া ইষ্টের আরাধনা করিবে। ইহাতে ভাল মন্দ নাই, নিন্দা খ্যাতি নাই। যাঁহারা সিদ্ধ সাধক, তাঁহারা সকলেই এই ভাব লইয়া সংসারের সহিত ব্যবহার করেন। যাঁহারা সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, প্রকৃত সদ্‌গুরু পাইয়াছেন, তাঁহারা তন্ত্রের এই বিচারের যথার্থতা স্বীকার করিবেনই।

শেষ কথা

গত কুড়ি বৎসর কাল সমাচারপত্রসকলের সহিত সংবদ্ধ হইয়া আমি প্রতি বর্ষে দুর্গোৎসবের কথা লিখিতেছি। প্রতি বর্ষেই যতগুলি লিখিয়াছি, সবই নূতন কথায় পূর্ণ করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি; তথাপি আজ পর্যন্ত আমার সকল কথা বলা হইল না। ইহা ছাড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গত চারি বৎসর কাল তন্ত্রকথা নিয়মিত ব্যাখ্যা করিতেছি। তন্ত্রের কোট্যংশের এক অংশ বলিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। সেই তন্ত্রের ভাবের ও সাধনার নির্যাস আমাদের এই দুর্গোৎসবে নিহিত রহিয়াছে; স্তরে স্তরে বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালী জাতির উত্থান পতনের কাহিনী এই উৎসবে লুকান আছে। উহার পূজাপদ্ধতিতে, উহার প্রতিমা নির্মাণে, উহার উৎসব আনন্দে এক এক যুগের উপাখ্যান লুকান আছে। দুর্গোৎসব বুঝিতে পারিলে বাঙ্গালা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে পারা যাইবে; উহা বাঙ্গালীর নিজস্ব, বাঙ্গালীর মনীষা ও প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা ও বিশিষ্টতা উহার সাহায্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহার অধঃপতনে বাঙ্গালার অধঃপতন, বাঙ্গালীত্বের অপচয় ঘটিয়াছে। এক বার এই দুর্গোৎসবকে বুঝিতে পারিলে, তোমার কাছে তোমার আত্মপরিচয় ফুটিয়া উঠিবে, সে পূজা এবং সে উৎসব বুঝিবার চেষ্টা করিবে না কি? ভাব লইয়া সংসার, ভাব লইয়াই জাতির পুষ্টি এবং অভ্যুদয়, সেই ভাবের মহাসাগর দুর্গোৎসব; সে দুর্গোৎসব ঠিকমত বুঝিতে পারিলে তুমি নিজেকে নিজে চিনিতে পারিবে, তোমার পিতৃপরিচয় অব্যাহত রাখিবার জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে পারিবে। যে সভ্যতার বিকাশে বাঙ্গালার এক দিকে শ্যাম, অন্য দিকে শ্যামা, এই দুই নীল কমল ভাবসরোবরে ফুটিয়া

উঠিয়াছিল, সে সভ্যতা নাই বটে, কিন্তু এমন দিন আসিতেছে, যখন তৃপ্তি, শান্তি, তুষ্টি লাভ করিতে হইলে আবার সেই হারানো সভ্যতার অন্বেষণ করিতে হইবে। তাই বলিতে ইচ্ছা করে,—এক বার দেখ না, এক বার বুঝ না—তোমার যাহা নিজস্ব ছিল, তোমার যাহা বিশিষ্টতার শ্লাঘা ছিল,… তাহা এক বার আবার তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। হয়ত কিছু মঙ্গল হইতে পারে, হয়ত কিছু কল্যাণ হইতে পারে।

দুর্গোৎসবের দুই চারিটা কথা বলিতেই পুথি বাড়িয়া গিয়াছে, দুর্গোৎসবের ভাবাংশের সার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কথা বলিতে পারি নাই। সেও ত এক নিশ্বাসে বলিবার নহে। আজ তোমরা গীতা গীতা করিতেছ; সকলেই নিয়মিত গীতা পড় আর নাই পড়, গীতার নিষ্কাম ধর্মের দোহাই দিতে তোমরা ছাড় না; নিষ্কাম ধর্মটা যে কি, তাহা সকামী, বিষয়ী, সংসারমায়ামুগ্ধ জীব আমরা কেমন করিয়া বুঝিব! কিন্তু ছিল এক দিন, যে দিন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে নিত্য চণ্ডী পঠিত হইত; ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি বলিয়া বাঙ্গালী সত্যের আদর করিয়া তৃপ্তি লাভ করিত। তখন বাঙ্গালী অন্য কাহারও কাছে কিছু চাহিত না; রাজার দ্বারে যাইয়া ধনৈশ্বর্য যাচ্ঞা করিত না, অর্থের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব পরিচয় লোপ করিয়া হাটে মাথা হারাইত না. তখন বাঙ্গালীর যাহা চাহিবার ছিল, যাহা চাহিতে হইত, তাহা ইষ্টদেবীর কাছেই চাহিত। তখন বাঙ্গালীর সকল আকাঙ্ক্ষা চণ্ডীর নিত্য পঠনপাঠনেই পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হইত। তাই বাঙ্গালী তখন বাঁচিতে জানিত, বাঁচিয়া থাকিতেও পারিত। তারাপুরের বামা ক্ষেপা এক বার বলিয়াছিলেন —'ওরে পাগলা, মা থাকতে কি ছেলে মরে? মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে বসিতে পারিলে, মারে কাহার বাপের সাধ্য! পুরাতন হইলে খোলস বদলাইতে পারে, বংশের ধারা, জাতির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। মায়ের ছেলে মরে না।' ভাবের কথা, ভাবের ভাষায় ব্যক্ত, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা প্রগাঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। মায়ের ছেলে হইয়া যত দিন আমরা ছিলাম, তত দিন আমরা বাঙ্গালী ছিলাম। মা কোল পাতিয়াই বসিয়া আছেন, বর্ষে বর্ষে এমনই ভাবে কোল ছড়াইয়া ছেলেদের সে ক্রোড়ে ডাকিবার জন্য আসিতেছেন। এক বার মায়ের ক্রোড়ে উঠ না। উঠিয়া সে ক্রোড়ে আবার বসিতে পারিলে সুখ পাইবে, শান্তি পাইবে, তৃপ্তি পাইবে, হারানিধি আবার খুঁজিয়া পাইবে। সে হারানিধি কি জান? সামাজিক উল্লাস এবং গৃহস্থালীর

সুখ ও স্বস্তি। এখনও সে সব পুরাতন কথা মনে পড়ে,—দুর্গোৎসবের সামাজিক আমোদ আহ্লাদ, সজীবতা ও উল্লাস, কুলাঙ্গনাদিগের সে সরল হাসিমাখা মুখে পূজার আয়োজনের আনন্দ—বরণ করিবার শোভা, ভোগ রাঁধিবার আনন্দ,—আর বিজয়ার দিন সে পাঁজরভাঙ্গা রোদন। 'আবার আসিস্ মা' বলিয়া মায়ের পায়ে অঞ্চল জড়াইয়া গৃহিণীদের সে রোদন যে দেখিয়াছে, সে তাহার মাধুর্য, তাহার পবিত্রতা কখনই ভুলিতে পারিবে না। আমরা ত মাটির পুতুল পূজা করিতাম না, জীয়ন্ত মাকে লইয়া কয়েকদিন আমোদ উৎসব করিতাম; তাই বিসর্জনের দিন শ্বশুরবাড়ী মেয়ে পাঠাইবার বেদনা গৃহে গৃহে ফুটিয়া উঠিত। বিশ্বাসের সে সজীবতা, ভাবের সে মাধুর্য, ভক্তির সে প্রগাঢ়তা আর পাইব কি? পাইতে হইলে আবার দুর্গোৎসব করিতে হইবে, আবার তেমনি আগমনীর সুরে সুর মিলাইয়া ডাকিতে হইবে—

'আয় মা আয়, আমার সতী আয়,
আমার কোলে আয়।'

শিবরাত্রি

'ধরাপোঽগ্নিমরুদ্ব্যোমমখেশেন্দ্বর্কমূর্ত্তয়ে।
সর্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ॥
প্রত্যস্তঃ কৃতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতজ্ঞাত্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ॥
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দেশায় শম্ভবে।
ভবায় ভবভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তুতে॥
তর্কমার্গাদিভূতায় তপসাং ফলদায়িনে।
চতুর্বর্গপ্রদাত্মায় সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ॥
আদিমধ্যান্ত-শূন্যায় নিরস্তাশেষভীতয়ে।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ॥
বিশ্বাত্মনেঽবিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলয়ে।
কন্দর্প-দর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমোঽস্তুতে॥

বিষাশনায় বিহরষ্ বৃষস্কন্ধমুপেয়ুষে।
সরিদ্ধামসমাবদ্ধকপর্দ্দায় নমো নমঃ॥
তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনে।
বিবাসসে নিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ॥
ত্রিমূর্তের্ম্মূলভূতায় ত্রিনেত্রায়াদিসম্ভবে।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জন্মঘ্নায় নমো নমঃ॥'

'যিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজ্ঞ, ঈশান, চন্দ্র ও সূর্য মূর্তিতে আবির্ভূত; যিনি সর্বভূতের অন্তরে অন্তরাত্মাস্বরূপ বিরাজমান, সেই শঙ্কর দেবকে নমস্কার। যিনি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য, যিনি শ্রুতিস্বরূপ, যাহার নানা মূর্তিতে আবির্ভাব কীর্তিত হইয়া থাকে, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য বস্তু, যিনি প্রকাশস্বরূপ, সেই নিত্য শঙ্কর দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যাঁহাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না, যিনি জগতের মঙ্গলকারী, যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দুঃখহারী শঙ্কর দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি তর্কশাস্ত্রের আদি প্রবর্তক, যিনি তপস্যার ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি চতুর্বর্গ প্রদানে সমর্থ, সেই সর্বজ্ঞ শঙ্কর দেবকে নমস্কার। যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, যাঁহার শরণ লইলে অশেষ ভীতি নিবারিত হয়, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই মহান্ নির্গুণ শিবকে প্রণাম। যিনি বিশ্বাত্মা, যাঁহার কোন প্রকার চিন্তা নাই, যাঁহার মৌলিদেশে চন্দ্র বিরাজমান, যিনি কন্দর্পের দর্প বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি কালভয়নিবারক, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি বিষ পান করিয়াছিলেন, যিনি বৃষস্কন্ধাধিরূঢ়, যাঁহার জটাকলাপে গঙ্গা বাস করেন, সেই শঙ্কর দেবকে নমস্কার। যিনি মায়াতীত, যিনি বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির অন্তরাত্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যিনি ত্রিপুরান্তক এবং পরিপূর্ণ মূর্তি, সেই পবিত্রনামা শঙ্করকে নমস্কার। যিনি নিজ ভক্তগণের প্রতি সর্বদা পরিতুষ্ট, এবং তাহাদিগের ভোগ-মোক্ষপ্রদ, যিনি দিগম্বর, যিনি বিশ্বস্বরূপ ভবনে বসতি করেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই ত্রিমূর্তির মূল কারণ, যিনি ত্রিনয়ন এবং আদিভূত, যাহাকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিলোক অবস্থিত, যিনি সাধকের জন্মনিবারক, সেই শঙ্করকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।'

আবার শিবচতুর্দশী আসিল এবং গেল। এই বসন্তে কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবের পূজা করিতে হয়। দিনের বেলায় পূজা নহে, পুরা রকমের নৈশ

পূজা। রাত্রিকালের চারি প্রহরে চারিটা শিব গড়াইয়া পূজা করিতে হয়; সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পূজা করিতে হয়। পূজার প্রধান অঙ্গ নিরম্বু উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ। যখন নৈশ পূজা এবং কৃষ্ণপক্ষের পূজা তখন বলিতেই হইবে ইহা তান্ত্রিকী পূজা। যখন তন্ত্র জাতির, নরনারী-নির্বিশেষে, পূজার ব্যবস্থা আছে, তখন বলিতেই হইবে ইহা তান্ত্রিকী পূজা। শিবপূজায় কেহই অনধিকারী নাই; আচণ্ডাল, ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সর্বজাতির এবং সর্ববর্ণের এ পূজায় সমান অধিকার আছে। শিবের প্রতীক, শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পাশাপাশি বসিয়া শিবপূজা করিতে পারেন; ধনী দরিদ্র সম্রাট এবং পথের ভিখারী পাশাপাশি বসিয়া শিবপূজা করিবে। শিবমন্দিরে লজ্জা করিতে নাই; অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কুললক্ষ্মী শিবপূজা করিবেন। সাধারণতঃ শিবপূজায় মন্ত্র নাই, পদ্ধতি নাই; ব্যোম্ ব্যোম্ বম্ বম্ মহাদেব বলিয়া শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালিলেই, সচন্দন বিল্বপত্র অর্পণ করিলেই শিবের পূজা করা হইবে। অর্থাৎ শিবের পূজায় কোন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে নিজের তৃপ্তির জন্য একটা পদ্ধতিক্রমে শিবপূজা করিতে পারেন, ভূতশুদ্ধি আসনশুদ্ধি করিয়া মন্ত্রের সাহায্যে শিবপূজা করিতে পারেন, আর মূর্খ অন্ত্যজ জাতির কেহ বিনা মন্ত্রে, কেবল বম্ মহাদেব বলিয়া সেই শিবের মাথায় জল ঢালিলে তাহার পূজার ফল ঠিক তেমনই হইবে। শিবপূজায় পুরোহিত নাই, গুরু নাই, মন্ত্র নাই, মন্ত্রজপ নাই; আছে কেবল পূজকের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। এমন উদার, সর্বজনীন পূজা কোন দেশের কোন ধর্মে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কেন এমন হইল? শিবপূজায় এত উদারতা শাস্ত্র দেখাইলেন কেন? উত্তরে বলিতে হইবে যে, শিব যে আমি—আমিই যে শিব। যত জীব তত শিব। আমি পণ্ডিত হই, মূর্খ হই, ব্রাহ্মণ হই, চণ্ডাল হই, হিন্দু হই, মুসলমান হই—আমি যাহাই এবং যেমনই হই না কেন, আমার তিনি আমারই মতন হইবেন। শিবপূজায় শিবের ধ্যান করিবার সময়ে নিজের মাথায় ফুল দিয়া নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। আরও একটা কথা আছে। শিব প্রধানতঃ সংহারমূর্তি; তাঁহাতে বিশ্বসৃষ্টি সংহৃত হয়, তাঁহাতে সর্বস্ব সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তিনি সর্বস্বের পরিণাম পরিণতির স্থান সকলের পক্ষে সমান। শ্মশানে বা গোরস্থানে রাজাপ্রজা পণ্ডিতমূর্খ, ব্রাহ্মণশূদ্র সবাই সমান। কেন না, দেহী মাত্রেরই পক্ষে একই রকমের পরিণতি; পরিণাম সম্বন্ধে দেহের বাছবিচার

নাই; রাজার দেহের যেমন পরিণাম হইবে, প্রজার দেহের তেমনই পরিণাম হইবে। সুতরাং পরিণতির দেবতা, শ্মশানের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবই সমান; তাঁহার কাছে জাতিবিচার নাই, উচ্চনীচ নাই, নরনারী নাই, ধনীদরিদ্র নাই। যেমন শ্মশানে সব এক, তেমনই শ্মশানের ঈশ্বরের কাছেও সব এক। পক্ষান্তরে নারায়ণ পালনকর্তা—রক্ষাকর্তা; তাঁহাকে সমাজ রক্ষা করিতে হইবে, বর্ণবিভাগ বজায় রাখিতে হইবে, অধিকার অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহাই দিতে হইবে: তাই নারায়ণের—বিষ্ণুর পূজায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার আছে, সে পূজায় একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে; নারায়ণের বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার সকল জাতির নাই। আরও একটা মজার কথা আছে। শিবের পূজায় শিবের প্রসাদ খাইবার ব্যবস্থা নাই: শিবকে ভোগ দিতে নাই; পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ অন্নভোগ দিতে নাই, দিলেও তাহা কাহাকেও খাইতে নাই। যিনি শ্মশানের দেবতা, তাঁহার ত ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকিবার কথা নহে, কেন না, তাঁহাতে যে সর্বস্ব যাইয়া সংহৃত হইতেছে, তাঁহা ছাড়া কিছু নাই, তাঁহার অতীত কিছু থাকিতে পারে না। যিনি সংহারের দেবতা, তাঁহার আবার প্রসাদ কি? যিনি রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, তাঁহারই ভোগরাগ প্রসাদ সম্ভবপর; কারণ তিনি যে সকলকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। আর শিব সকলকে আত্মসাৎ করিবেন; শিবোঽহম্ বলিতে পারিলেই শিবপূজা সার্থক হইল।

আমাদের কোন দেবতারই, কোন ধ্যানগম্য ইষ্ট দেবতারই একটা স্বতন্ত্র রূপ নাই। যে দেবতা যে গুণোপেত, যাহা হইতে যে ঐশ্বর্যের বিকাশ দেখিতে চাহি, তাঁহার রূপও সেই গুণ বা ঐশ্বর্যের অনুকূল হইবে। শিব যখন 'আমি আছি' এই জ্ঞানের দ্যোতক, অখণ্ড দণ্ডায়মান কালস্বরূপ, তখন তাঁহার প্রতীক শিবলিঙ্গ; রূপ নাই, দেহ নাই, নেত্রস্কন্ধ নাই, ভাব ভঙ্গী নাই, প্রবৃত্তি প্রকৃতি নাই—আছে কেবল অস্তিত্বের জ্ঞাপক একটা প্রতীক—একটা চিহ্ন। সে চিহ্ন কিসের? সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের; এই গূঢ় রহস্য যাঁহাতে সম্পুটিত তিনিই অনাদিলিঙ্গ মহাদেব। শিব যখন সংহারমূর্তি রুদ্র, তখন তাঁহাতে কেবল সংহৃতিরই বিকাশ দেখান হইয়া থাকে। আমাদের মূর্তিপূজা ভাবের মানচিত্রের পূজা মাত্র। শিবের ধ্যান আর কিছুই নহে, হৃদয়পটে শিবভাবের মানচিত্র লেখা মাত্র। সেই মানচিত্র যাহার হৃদয়ে যত ক্ষণ অঙ্কিত থাকে, তাহার জীবন তত ক্ষণ ধন্য হয়। প্রথমে শব্দবস্তু, অর্থাৎ Word

painting, শব্দের সাহায্যে ভাবের আলেখ্য নিরূপণ চেষ্টা মাত্র ; তাহার পরে ধ্যান, অর্থাৎ শব্দ-আলেখ্য অনুসারে মানসপটে ভাগবত রূপের নিরূপণ। সেই রূপ স্থির হইলে, মনে গাঁথিয়া গেলে তাহারই প্রতিমা গড়িয়া বাহিরের দশ জনকে দেখাইতে হয়। সাধারণ লোকে সেই রূপ দেখিয়া উহাকে মনে মনে গাঁথিবার চেষ্টা করে ; বাহিরের পট মনে গাঁথিয়া বসিলে, তখন শুবস্তুতির নিকষে সেই ধ্যানগম্য মূর্তিকে কষিয়া লইতে হয়। এই চেষ্টার ফলে, সাধারণ সাধকের মনে ভাবোদয় হইতে পারে,—হইয়াও থাকে। এই ভাবোদয়ের সহায়তা করিবার জন্যই প্রতিমা-পূজা প্রবর্তিত। গত বর্ষে এই শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবধ্যানের ভাবার্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম ; এবার আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। কেবল এইটুকু মনে রাখিলেই হইবে যে, সাধন-পদ্ধতি নির্দেশ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কোনটাই বাজে নহে—নিরর্থক নহে। আমাদের সাধনশাস্ত্র ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণের পদ্ধতি অনুসারে লিখিত ; গোড়ায় আবৃত্তি—সিদ্ধান্তের আবৃত্তি, পরে সেই সিদ্ধান্ত বুঝাইবার জন্য রেখাঙ্কিত চিত্রের লিখন, শেষে সেই চিত্র দেখাইয়া সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান ও উন্মেষ। সাধন জ্যামিতি বুঝিতে এবং বুঝাইতে জানি না, সে বিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই এত গোল ঠেকে এবং শাস্ত্র লইয়া এত বিতণ্ডা, এমন অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

বসন্তকালে শিবচতুর্দশী কেন ? সৃষ্টির স্ফুরণকালে, যখন দ্বৈতভাবে প্রবল প্রকাশ আরব্ধ হইয়াছে, তখন অদ্বৈততত্ত্বামৃত বুঝাইবার জন্য, ঘোরনিশায় চৌকি হাঁকার মতন, গৃহস্থকে সজাগ রাখিবার উদ্দেশ্যেই শিবচতুর্দশী ব্রতের ব্যবস্থা। বসন্তে জীব আত্মহারা হয়, নিজেকে বিলাইয়া দিতে চাহে, নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য সৃষ্টির সর্বস্বে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় ; যেখানে যেটি মধুর, সুন্দর, মনোহর, সেইখানেই নিজের মধুময়, সুখময় আমাকে হরির লুট করিয়া ছড়াইয়া দিতে চাহে এই আত্মবিসর্পণের সংরোধ ঘটাইবার জন্য শিবরাত্রির উপবাস। ঘোর নিশাকালে যখন আমি ছাড়া আর কিছুরই অনুভূতি হয় না, যখন আমি আছি এই জ্ঞানটাই প্রবল থাকে, যখন আমার অস্তিত্বে আমার সৃষ্ট সংসার যেন সংক্ষুব্ধ থাকে, তখন আমার অস্তিত্বকে শিবরূপ জ্ঞান করিয়া আমার সর্বস্ব তাঁহাতেই অর্পন করিতে হয়। আমার জৈব আসক্তি ব্যাধরূপে আমার মেরুদণ্ডরূপী বিল্ববৃক্ষের প্রবৃত্তির ডালে বসিয়া আছে, সেই ব্যাধ সারা দিন হিংসা করিয়া, শিকার করিয়া নিজ পুষ্টির জন্য মাংস

সঞ্চয় করিয়াছে। তাহা প্রবৃত্তির ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। মেরুদণ্ডরূপ বিল্বমূলে অহমস্মি এই জ্ঞানরূপী অনাদিলিঙ্গ শিব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহার চারি দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে বেষ্টিত হইয়া বিল্ববৃক্ষের উপর জড়াইয়া উঠিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মক ত্রিপত্র বিল্ববৃক্ষকে শোভিত করিয়া আছে। বাহিরে ভীষণ ঝড়—ষড়্‌রিপুর তুফান-তরঙ্গে সৃষ্টি যেন বিক্ষুব্ধ, সঞ্চালিত, সদান্দোলিত। সে ঝড় দেখিয়া আসক্তিরূপী ব্যাধ ভয়ে সঙ্কুচিত; এতটাই ভীত যে, আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত। আমি না থাকিলে, আমার ত কিছুই থাকে না,—আমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, আমার দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, আমার সুখ দুঃখ, আমার ষড়্‌রিপু, আমার মানবতা—আমার সব যায় যে! ভয়ে আসক্তি এতটাই সঙ্কুচিত যে, প্রায় আত্মস্থ। তখন ত্রিগুণাত্মক বিল্বপত্রের সঙ্গে হিংসার পরিণতি সেই সঞ্চিত মাংসের রস, ভিতরে—নীচে—মূলে আত্মারাম শিবের মাথায় পড়িল। অমনি আত্মস্বরূপ শিবের প্রকাশ। সে শিব বলিয়া উঠিলেন,—'তুমি নাশভয়ে ভীত হইয়াছ, এই যে আমিই নাশের দেবতা, আমাতে তুমি সম্মিলিত হও, তোমার নাশভয় থাকিবে না। আমিই শেষ, আমি ছাড়া আর কিছু নাই, আর কিছু থাকিতে পারে না। তাই শেষ নাগসকল আমার সর্বাঙ্গে বিজড়িত। সংসারের বিপরিণামের ফলে যাহা বাকী থাকে, যাহার আর অন্য পরিণতি নাই, তাহাকেই শেষ বা essence বলে। এই শেষ নাগ—যাহার অন্যত্র যাইবার উপায় নাই, এমন সামগ্রী হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ সৃষ্টির পর্বে পর্বে, মর্মে মর্মে, মজ্জায় মজ্জায় এই শেষ নাগ বিরাজিত। সংহারের এক মাত্র উপাদান বিষ, দেহ বিষাক্ত না হইলে দেহপাত হয় না। সেই বিষ, সেই নাগের আধার আমার কণ্ঠে নিত্য বর্তমান, তাই আমি নীলকণ্ঠ। হিংসাই তোমার জীবনের অবলম্বন, সেই হিংসা হইতে উৎপন্ন সিংহ শার্দূল আমার কাছে মৃত—শব; আমি তাহাদের চর্ম লইয়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছি। আমি সর্ববর্ণের সমন্বয়ে রজতগিরিবৎ, কিন্তু যেখানে অজ্ঞেয়তার আধার, সেইখানেই আমি নীললোহিত। ব্যোমমার্গ আমার কেশ, সে কেশের জটাভারে ত্রিপথগা গঙ্গা—সৃষ্টির অনুরাগরূপিণী তরলতরঙ্গিণী কুল কুল ধ্বনিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; ব্যোমপথের সীমা নাই, আমার জটাভারেরও সীমা নাই। সৃষ্টিশক্তি-বিলাসিনী যাহারা বামরূপে আমার বামাঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। আমাতেই সব, আমিই সকলের সমাপ্তি; তাই আমার শ্মশানবাস। আমি সেই শ্মশানে শবরূপে

ছিলাম; তোমার ভয়ভীত আত্মার কাতর আহ্বানে, তোমার অনুরাগের প্রবল সঞ্চালনে আমি শক্তিময় হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। এস, এস, ক্রোড়ে এস—আমাতে আসিয়া সম্মিলিত হও।'

ইহাই শিবচতুর্দশী। ভয়ের সাহায্যে আত্মার অন্বেষণ; আর্ত্তের চেষ্টায় সহসা আত্মদর্শন। ভয় কিসের? প্রবল বসন্তে সৃষ্টির ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখিয়া, সেই আবর্ত্তবেগে সৃষ্টির সাগরে ফেনোর্মির বিকট বিকাশ দেখিয়া আত্মার সংক্ষোভ। এই সংক্ষোভ হইতেই আত্মবিকাশ—শিবত্বের উন্মেষ। কথায় আছে—জীবনে মরণ, মরণে জীবন। জন্মিলেই মৃত্যু, মরিলেই নবজীবন। বসন্ত জনমের ঋতু, তাই সঙ্গে সঙ্গে মরণের ইঙ্গিতও করিতে হয়। শিবচতুর্দশী সেই মরণের সৃষ্টির বিপরিণামের ইঙ্গিত মাত্র। এক দিকে নারায়ণ দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তিতে বসন্তের অনুরাগরক্তিম হইয়া মদনোৎসব করিতেছেন; এক হইতে দুই, দুই হইতে বহুতে পরিণত হইতেছেন; হ্লাদিনীর বিমল বিকাশে রাধা সতী অনুরাগভরে সৃষ্টির হিন্দোলে দুলিতেছেন; মদনপূজার ধুম লাগিয়া গিয়াছে, অন্য দিকে মদনান্তক মহাদেব সংহারমূর্ত্তির বিকাশ করিয়া, সর্বস্বে আত্মবিস্তার করিয়া সর্বস্বকে আত্মস্থ করিতেছেন। দিনের বেলার মদনমোহনের লীলা, নিশাকালে মদনমথনের মহাদেবের লীলা। এক দিকে বিকাশ, অন্য দিকে সঙ্কোচ। এক দিকে দ্যুতি, রতি, বিস্তৃতি অন্য দিকে তমিস্রা, সংহৃতি, স্তুতি। সৃষ্টির ও বিনাশের এই প্রহেলিকা বুঝাইবার জন্যই শিবচতুর্দশীর ব্রত। ইহা অনন্ত সাগর; যত ডুব দিবে, ততই ইহার মহিমা বুঝিতে পারিবে।

'নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥'

তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য

তন্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে অনেকগুলি কথা সাধারণ ভাবে আমি পাঠকগণকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন যে ভাবে যে সকল তন্ত্র-গ্রন্থ এ দেশে প্রচলিত আছে, তাহা হইতে তত্ত্বকথা খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন।

তন্ত্রের সংহিতাভাগ এবং উপনিষৎভাগ সাধারণ্যে প্রচলিত নাই। শারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, বৃহৎতন্ত্রসার প্রভৃতি সঙ্কলনগ্রন্থ হইতেই তন্ত্র-কথাসকল খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; তাহা ছাড়া মহানির্বাণ তন্ত্র, কুলার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থও আংশিক ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপর যাহার কাছে যেমন পুঁথি আছে, সে তদনুসারে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশের জন্য সমর্থক বচনপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। তন্ত্র গুরুমুখ করিয়াই পড়িতে হয়, গুরুপরম্পরা অনুসারে উহার ব্যাখ্যা নানা ভাবে ও রকমে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। শিবের পঞ্চ মুখ হইতে পাঁচটা আম্নায় নির্গত হইয়াছে, এই পাঁচটা আম্নায় অনুসারে তন্ত্রের পাঁচটা পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্য বা philosophy ঊর্দ্ধ্বাম্নায়ে নিবদ্ধ ছিল। এখন আর পাঁচটা পদ্ধতি স্বতন্ত্র ভাবে ব্যক্ত নাই; আম্নায় অনুসারে পুঁথিসকলের বিভাগ নাই, আম্নায় অনুসারে গুরুপরম্পরার বিচারও কেহ করে না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাল হইতে আম্নায়ের বিচার একরকম লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজের শাসনকালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালায় কেবল গুরুপরম্পরা ধরিয়া তান্ত্রিকদিগের শ্রেণীবিভাগ হইত। ইংরেজের শাসনের পর হইতে সে পক্ষেও বিষম গোলযোগ ঘটিয়াছে। তবে তন্ত্রের বিরাট বিশাল অসংখ্য পুস্তকরাশি দেখিলে ইহা মনে স্থির ধারণা হয় যে, এক কালে এই তান্ত্রিক ধর্ম বাঙ্গালার জাতীয় ধর্ম ছিল, রাজমান্য এবং রাজার দ্বারা পরিচালিত ধর্ম ছিল। এই সকল তন্ত্রপুস্তকের মধ্যে বাঙ্গালার দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস লুকান আছে, যুগে যুগে জাতির পদ্ধতি, রীতি নীতির কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই তন্ত্রসাগর মন্থন করিতে পারিলে বাঙ্গালার বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইতে পারে, বাঙ্গালা ইতিহাসের বহু তমসাবৃত কোটরে আলোকমালা ফুটিয়া উঠিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, ছিল এক দিন, যখন বাঙ্গালীর সহিত তিব্বত ও চীনের, ব্রহ্ম ও তাতারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যখন বাঙ্গালার সিদ্ধ সাধকগণ তিব্বতে ও চীনে, শ্যামে ও আসামে, জাপানে ও তাতারে যাইয়া তন্ত্রধর্ম প্রচার করিতেন, সকল দেশের পণ্ডিতগণ বাঙ্গালায় আসিয়া সাধনতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন। ছিল এক দিন, যখন বাঙ্গালীর সহিত তিব্বত ও চীনবাসীদের বৈবাহিক আদান-প্রদান চলিত, যখন শৈব বিবাহের প্রভাবে বাঙ্গালী এশিয়ার পূর্বদিকের সকল প্রধান জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ ছিল। শৈব বিবাহপদ্ধতিটা রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্যন্ত এই বাঙ্গালা

দেশে সাধারণ ভাবেই প্রচলিত ছিল। এই শৈব বিবাহের ফলে বাঙ্গালার যে জাতিবিচারে কতটা গণ্ডগোল ঘটিয়াছিল, তাহা এখন আমরা সহজে আর বুঝিতে পারি না। শৈব বিবাহ ছাড়া, ভরার মেয়ে বিবাহ করা, কামপত্নী রাখা, বাঙ্গালার অবস্থাপন্ন লোক মাত্রেরই নিয়মিত ব্যবহার ছিল। মগ, চীনা ও তিব্বতীয়দিগের সহিত আমাদের যে কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাকালের বড় বড় বাঙ্গালী তিব্বতে ও চীনে যাইয়া নিয়মিত বাস করিতেন, তিব্বতের গুরু দুম্-পা প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাঙ্গালায় আসিয়া ঘর-সংসার পাতাইতেন। একে ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালায় জাতিবিচার কতকটা লোপ পাইয়াছিল, তাহার উপর বরেন্দ্রভূমিতে, উত্তর-বাঙ্গালায় বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে সমাজে অনেকটা একাকার হইয়াছিল; তাহার উপর বৈষ্ণবদের ভেক, তান্ত্রিকদিগের শৈব বিবাহ এই একাকারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

সমাজের এই সকল কথা তন্ত্রের মধ্যে লুকান আছে। বল্লালসেনপ্রমুখ রাজগণ দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেও, তন্ত্রের প্রভাব বল্লালের মত রাজাও এড়াইতে পারেন নাই; তাহারও একটি চণ্ডালিনী শক্তিরূপে ছিল, তিনিও তন্ত্রসাধনা করিতে উদাসীন ছিলেন না। এই চণ্ডীপূজার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইলে বাঙ্গালার অনেক কথা প্রকাশ পাইবে। চণ্ডীকে 'হাড়ির ঝি' কেন বলা হয়, কেন চণ্ডীপূজার প্রকরণ বাঙ্গালার ব্যবসায়ী সাধু বেনিয়াদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল, কেন মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, বেনিয়া-সওদাগরের কথাই আছে. উলার উলাইচণ্ডী কে, আস্তার চণ্ডী কে এবং কোথা হইতে আসিল, এ সকল কথা ঠিকমত বুঝিতে পারিলে বাঙ্গালী জাতির একটা দুর্গম ইতিহাস কথা আমরা জানিতে পারিব। তাহার পর শ্রীচৈতন্যের প্রাদুর্ভাব-কালে বাঙ্গালায় সামাজিক কেমন একটা ওলটপালট হইয়াছিল, শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কেমন করিয়া বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকগণের মধ্যে একটা আপোসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে আপোসের ফলে সমাজের কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহাও আমরা ভাল করিয়া বুঝি নাই। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালার সমাজের আভ্যন্তরীণ দশা কেমন ছিল, তাঁহার মধুর রসের সাধনাপদ্ধতি প্রচারের প্রভাবে বাঙ্গালায় জাতিসকলের কেমন করিয়া সমীকরণ হইয়াছিল, তাহারও কোন পরিচয় আমাদের জানা নাই। পরে নাটোর এবং কৃষ্ণনগরের

ব্রাহ্মণ-রাজবংশের প্রভাবে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ধর্ম আবার কেমন করিয়া মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কবিগণ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর সমাজের উপর ব্রাহ্মণ্যের পালিশ চড়াইয়াছিলেন, সে তত্ত্বটাও আমরা বুঝিতে শিখি নাই। কেন চণ্ডীর গান স্বর্ণকার শিল্পী জাতি বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছিল, কেন রামপ্রসাদের কালীকীর্তন চাপা পড়িয়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রবল হইয়াছিল, কেন শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুকুন্দরামের চণ্ডীই এ দেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে, ইহারও গুপ্ত তত্ত্ব আমরা জানি না। তন্ত্র না পড়িলে এ সকল কথা বুঝা যাইবে না। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাঙ্গালায় অনেক জাল জুয়াচুরি চলিয়াছিল, ঘটক ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করিয়াছেন, স্মার্ত নাটোর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ-রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরও অনেক গোলমাল ও গোলযোগ স্মৃতিশাস্ত্রের রূপার তবকে ঢাকা পড়িয়াছে। এই সকল আবরণ খুলিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে তন্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালার গত দুই হাজার বৎসরের প্রকৃত ইতিহাস প্রচার প্রয়োজন, তীব্রবুদ্ধি ঐতিহাসিকগণের সাহায্যে উহাদের আলোচনার প্রয়োজন, এবং নির্ভয়ে সত্য কথা ব্যক্ত করিবার বুকের পাটারও প্রয়োজন; এই তিন প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস ঠিকমত প্রকাশিত হইবে না, বাঙ্গালার পুরাতন গৌরবের মহিমা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। ইহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। কেন পাঠানগণ বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশ তাঁহারা কি ভাবে জয় করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালা জয় করিয়া পাঠানগণ কোন্ পদ্ধতিক্রমে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের স্মারক চিহ্নসকল মুছিয়া ফেলিতে উদ্যম করিয়াছিল, পাঠানদের উপদ্রবে বাঙ্গালায় কোন্ জাতি মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তান্ত্রিকগণ সে মুসলমানদের সঙ্গে কোন্ পথে আপোস করিতে পারিয়াছিলেন, পরে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচারিত হইলে মুসলমানদের সহিত আমাদের কেমন সম্বন্ধ হইয়াছিল,—এ সকল কথাও জানিতে পারিলে, বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস আমরা বুঝিতে পারিব না। তন্ত্রসাগর মন্থন করিতে না পারিলে, এ সব কোন কথাই আমরা বুঝিতে পারিব না। ইতিহাসের হিসাবেও তন্ত্র অমূল্য সামগ্রী—অতুল্য এবং অদ্বিতীয়।

একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব, আমরা তন্ত্রের মাহাত্ম্য কতটা উপেক্ষা করিয়া থাকি। রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম এ দেশে প্রচার করেন,

তাহা তন্ত্রধর্মের একটা শাখা মাত্র। মহানির্বাণ তন্ত্রের গোড়ার কয়টা উল্লাস আদি ব্রাহ্ম সমাজের বুনিয়াদস্বরূপ। উহাতে লিখিত তন্ত্রস্তোত্রসকল এখনও আদি সমাজে নিয়মিত পঠিত হয়, উহার দীক্ষাদান-পদ্ধতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবিতকাল পর্যন্ত আদি সমাজে প্রচলিত ছিল। এমন কি, ঠাকুরবাড়ীর যে বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাও মহানির্বাণ তন্ত্রসম্মত। ইদানীং বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং তান্ত্রিকগণের ব্যবহারদোষে তন্ত্র সর্বসমাজে নিন্দনীয় হওয়াতে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহানির্বাণ তন্ত্রসম্মত আদি ব্রাহ্ম ধর্মের উপর উপনিষদের ধর্মের আবরণ দিয়াছিলেন। সাধারণ্যে উপনিষদের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার করা হইত, পরন্তু দীক্ষিত ব্রাহ্মের সাধন বিষয়ে মহানির্বাণ তন্ত্রের পদ্ধতিই অবলম্বিত হইত। সেই আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপর কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র খ্রীষ্টানীর মশলা চড়াইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের উপরে বিলাস মাখাইয়া সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়। মহানির্বাণ তন্ত্রের পদ্ধতি হইতে ব্রাহ্ম সমাজ যতটা দূরে গিয়ে পড়িয়াছেন, ততটা দেশের লোকের সমবেদনা হারাইয়াছেন,—ততটা উহা বিজাতীয় আকার ধারণ করিয়াছে। যাউক সে কথা; আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে কোনটাই তন্ত্রতত্ত্বের গণ্ডীর বাহিরে নহে। বাঙ্গালায় যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এ দেশে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তাঁহারা খাঁটি বৈদিক ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যেও তন্ত্রপ্রভাব প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পরে তাঁহাদের বংশধরগণ বাঙ্গালায় কুলীন হইয়া তন্ত্রধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্যদিগের বৌদ্ধ তন্ত্র এখনও এই বাঙ্গালায় লোপ পায় নাই, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের আবরণে সে ধর্ম এখনও সজীব আছে। বাঙ্গালীর মেয়েলী ব্রত উৎসবের মধ্যে খুঁজিলে এখনও বৌদ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়; তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত যেন ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে। যে কোন তন্ত্র খুলিয়া দেখ না, সাধনা ও আরাধনার কাণ্ডে জাতিবিচার নাই, কেবল অধিকারবিচার আছে। বলিতে পার, ইহাই তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র। অন্ততঃ বজ্রযানী ও কালচক্রযানী বৌদ্ধগণের ইহাই মত। এই মহাযানী বৌদ্ধগণ আধুনিক তন্ত্রের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

আধুনিক এমন একখানা তন্ত্রের পুঁথি পাইলাম না, যাহাতে বৌদ্ধ মনীষার প্রভাব দেখিতে পাইলাম না। তবে তন্ত্রের যেকোন পুঁথি পাঠ কর না কেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, অতি পুরাতন একটা শক্তিধর্মের বুনিয়াদের উপর বৌদ্ধ মনীষা একটা নূতন ধর্মের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, পরে নব্য হিন্দুর ব্রাহ্মণপ্রতিভা বৌদ্ধের সেই মনীষা-প্রাসাদের উপর ব্রাহ্মণ্যের লেখা গাঢ় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। একটু বুঝিয়া হিসাব করিয়া তন্ত্রের পুঁথি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, উহার স্তরে স্তরে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালা জাতির ইতিহাস লুকান রহিয়াছে; কারণ, তন্ত্রধর্ম জাতির হিসাবে বাঙ্গালারই ধর্ম, বাঙ্গালীরই ধর্ম; বাঙ্গালীর প্রতিভা যেন দ্বাদশ সূর্যের মতন তন্ত্রের পত্রে পত্রে জ্বলিতেছে; যে দেখিতে জানে, সেই দেখিতে পায়—তাহারই জীবন ধন্য হয়।

একটা মজার কথা বলিব। বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটা ধারা বহিতেছে; একটা চণ্ডীমঙ্গল, অন্যটা ধর্মমঙ্গল; রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক কথা, বাঙ্গালা ভাষায় কতকটা আধুনিক ব্যাপার। রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল হইতে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পর্যন্ত বাঙ্গালায় যত ধর্মমঙ্গল প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলেরই নায়ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে, বেনিয়া সওদাগর বা অন্য কোন মল্ল জাতি। চণ্ডীমঙ্গলেরও সেই কালকেতু ধনপতি সওদাগর, সেই ব্যাধ ও ইতর শ্রেণীর কথা। শিবায়ন ও মনসার গানেও ঐ ব্যাপার। তবে উপর্য্যুপরি ব্রাহ্মণ কবিগণ এই সকল বিষয়ে কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া ধীরে ধীরে উহাদের উপর ব্রাহ্মণের ভাব প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীর গানের শেষ ব্রাহ্মণ সংস্করণ। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্রাহ্মণ কবির লিখিত হইলেও উহাতে ব্রাহ্মণেতর জাতির মহিমা অধিক লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার তেমন পরিচয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য গোড়ায় ঠিক ব্রাহ্মণের সাহিত্য ছিল না; বাঙালা সাহিত্য গোড়ায় ব্রাহ্মণেতর জাতিরই সাহিত্য ছিল, দেশের ইতর জাতির সাহিত্য ও ধর্মের ভাষা ছিল। গোড়ায় ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য লইয়া মগ্ন ছিলেন, দেশের জনসাধারণের ভাষা এবং ধর্মের প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখিতেন না। তখন দেশের ব্রাহ্মণেতর জাতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। মহাযানী সম্প্রদায়ের বজ্রযানী ও কালচক্রযানীদের নানা শাখা উপশাখায় ধর্ম অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণে পরিতৃপ্ত থাকিত। এই সময়ে বাঙ্গালার তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের সহিত তিব্বতের ও চীনের বৌদ্ধগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

কান্যকুব্জ, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজার আহ্বানে আসিয়াছিলেন, রাজার আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার আদিম সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না, বাঙ্গালীর ভাবনা ভাবিতেন না; তাঁহারা নিজের ঘরে বসিয়া যাগ যজ্ঞ হোম করিতেন এবং বৈদিক কর্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। বাঙ্গালায় পাঠান আক্রমণের পর বাঙ্গালার কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত খাস বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ ধীরে তান্ত্রিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া, তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ সাধক হইয়া সমাজের উপর নেতৃত্ব আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় বৌদ্ধ তন্ত্র ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য ভাবে বিমণ্ডিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ত্রিপুরানন্দ প্রভৃতি তন্ত্রের নানাবিধ সঙ্কলনগ্রন্থ রচনা করিয়া তন্ত্রে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রভাব ফুটাইয়া তুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ কবিগণ দেশপ্রচলিত কিম্বদন্তী ও ধর্মের কথা অবলম্বন করিয়া, পুরাতন ধারার সহিত একটা নূতন কাব্যের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন। বাঙ্গালী ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং ভাবের শাসনাধীন হইয়া পড়িল। বাঙ্গালীকে ব্রাহ্মণশাসনাধীন করিতে পূর্বকালের ব্রাহ্মণগণকে তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ ধর্মের সহিত অনেকটা আপোস করিতে হইয়াছিল। সে আপোসের চিহ্ন বাঙ্গালার মঙ্গল ব্যবস্থাগ্রন্থে সকল কাব্যগাথায় এখনও পরিস্ফুট আছে। তবে আধুনিক তন্ত্রগ্রন্থে যে এই আপোসের নিদর্শন অতি সুস্পষ্ট, তাহা তন্ত্রের পাঠক মাত্রেই জানেন। বাঙ্গালার নানা জাতির ইতিহাস খুঁজিতে হইলে তন্ত্র হইতে যত সত্য—প্রকৃত কথা বাহির হইবে, এত আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এইখানে আর একটা কথা বলিব। যখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম বাঙ্গালায় প্রবল ছিল, তখনও কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য ছিল। সে সকল ব্রাহ্মণ বৈদিক আচারভ্রষ্ট ছিলেন, তন্ত্রসাধনায় তাঁহারা জাতিবিচার করিতেন না; তাঁহারা চীন তিব্বতে যাইয়া শবরাচার অবলম্বন করিতেন, সে দেশের ভোজ্য পেয় গ্রহণ করিতেন। এই সকল ব্রাহ্মণ শক্তি রাখিবার ছলে বহু অন্ত্যজ-জাতীয়া নারীকে শৈব পদ্ধতিমতে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার চালাইতেন। চণ্ডীদাস রামী রজকিনীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া, সে কথা গোপন করিতেন না, তজ্জন্য লজ্জা বোধ করিতেন না। বাশুলী পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণগ্রাহ্য কোন দেবতা নহে; উহা বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবতা; সহজিয়া ধর্ম খাস বৌদ্ধ ধর্ম,

সিদ্ধাচার্যগণের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম। ব্রহ্মানন্দ গিরি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার হাড়ীজাতীয়া এক রমণী শক্তি ছিল; তিনি এই হাড়ীর ঝিকে চণ্ডী বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং তাহার সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রকাশ্য ভাবে রাখিতেন। হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, রজক, নাপিত প্রভৃতিজাতীয়া নারী না হইলে যেন সেকালের ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকদিগের তন্ত্রসাধনাই হইত না। তন্ত্রে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, বশিষ্ঠ ঋষি কামরূপে (কেহ বলেন, রামপুর-হাটের কাছে তারাপুরে) তারা আরাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রকাশ করেন যে, যত জীব, তত শিব, যত নারী, তত শক্তি; অতএব সাধনচক্রে জাতি-বিচার নাই, কেবল অধিকারীর বিচার করিবে। বশিষ্ঠের এই ব্যবস্থা অনুসারে বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তরবাঙ্গালায় তিব্বত ও চীনের, ব্রহ্মের ও মগদেশের বহু নরনারী শৈব বিবাহপদ্ধতিক্রমে বাঙ্গালার নানা জাতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই শৈব বিবাহের প্রভাব রঘুনন্দনের স্মৃতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থপ্রমুখ উচ্চ জাতিদের মধ্যে অনেকটা সঙ্কোচ লাভ করিয়াছিল; পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে উহা শিষ্টসমাজ হইতে অনেকটা লোপই পাইয়াছিল। যাঁহারা তন্ত্রসাধনা করিতেন, তাঁহারা গোপনে শক্তি রাখিয়া কাজ করিতেন। রাজা রামমোহন রায় কিন্তু সেটুকুও গোপন রাখিতে পারেন নাই।

অন্য দিকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের ফলে বাঙ্গালার হীনযান শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম বৈষ্ণব আকার ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Modern Buddhism বা আধুনিক বৌদ্ধ ধর্ম শীর্ষক গ্রন্থে এ তত্ত্বটা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেবল হীনযানী বৌদ্ধ কেন, মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের এক শাখা মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিতে পারিয়াছিল। এই যে কর্তাভজা, কিশোরীভজা প্রভৃতি সাধনার প্রণালী এ দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতি এখনও অনেকটা ফুটিয়া আছে। ভারতবর্ষের নানা দেশের বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে; অনেক সম্প্রদায়ে অবলোকিতেশ্বরের পূজা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। সে অবলোকিতেশ্বর এখন শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে, পূর্বে বুদ্ধের প্রতিমূর্তিই পূজিত হইত। শাস্ত্র বলেন,—দ্বিজাতি ব্যতীত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

ব্যতীত অন্য কোন জাতির সন্ন্যাসে অধিকার নাই। কিন্তু গরীবদাসী, কাণফোড়, নাগা নাগপন্থী, রামানন্দী প্রভৃতি এমন বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় জাতিবিচার না করিয়া যাহাকে তাহাকে স্ব-স্বদলভুক্ত করিয়া লয়। নাগারা ত পূর্বে ছেলে চুরি করিয়া আনিয়া, সেই সব শিশুকে প্রতিপালন করিয়া নিজেদের দল পুষ্ট করিত,—এখনও করিয়া থাকে। এই হেতু যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে শিশু রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই; কথাতেই আছে—জাতি হারাইলেই বৈষ্ণব। বাঙ্গালার ছত্রিশ জাতি সম্পিণ্ডিত হইয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমের কবীরপন্থী, নানকপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ও নানা জাতির সমবায়ে সৃষ্ট—নানা জাতির সম্মেলনে উদ্ভূত। বরং বাঙ্গালায় কুলাচার্যগণ থাকাতে, কুলজী গ্রন্থসকল থাকাতে অনেক জাতির একটা হিসাব, একটা ইতিহাস পাওয়া যায়; বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই বিরাট্ দেশে জাতি বিশেষের পরিচয় পাওয়া দুর্ঘট; এমন কি, ব্রাহ্মণের শাখাবিশেষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না—বিশেষ কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না।

এই সকল কথা একটু ঘুরাইয়া, বার বার বলিবার একটু হেতু আছে। বাঙ্গালী যেন নিজেকে চিনিবার জন্য, জাতির অতীত ইতিহাস ঠিকমত জানিবার জন্য একটু উদ্যত হইয়াছে। এই জন্য কেহ বা কুলজী গ্রন্থ সকল ঘাঁটিতেছেন, কেহ বা তাম্রশাসন খুঁজিতেছেন, কেহ বা শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতেছেন। এ সব ভাল কথা বটে, উত্তম উদ্যম বটে; পরন্তু বাঙ্গালীকে ঠিকমত চিনিতে হইলে তন্ত্র না পড়িলে ঠিক পরিচয় জানা যাইবে না। তন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অতি পুরাতন কাল হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যে বাঙ্গালায় খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালার পুরাতন ইতিহাস অনেকটা লুকান আছে! সে লুকান কথা বুঝিতে হইলে তন্ত্র পড়িতেই হইবে; চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে তখনকার বাঙ্গালার অনেকগুলি ছবি আছে, পাষণ্ডীদের অনেক মজার গ্লানির কথা আছে। সে সব বাছিয়া বাহির করিতে পারিলে বাঙ্গালীর অনেক বিস্মৃত সামাজিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব বুঝিতে হইলে, ঠিক জিনিস ঠিক স্থান হইতে বাহির করিতে হইলে তান্ত্রিক আচার পদ্ধতি, রীতি নীতি জানা প্রয়োজন। এই হিসাবেও তন্ত্র বাঙ্গালীর পক্ষে অমূল্য গ্রন্থমালা। জাতির

cohesiveness বা সংহতিশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে তন্ত্রের শক্তিধর্ম যে প্রবল ও প্রকৃষ্ট উপায়; চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত বাঙ্গালার ছত্রিশ জাতিকে এক সূত্রে সমভাবে বন্ধন করিতে তন্ত্র যতটা সহায়তা করিয়াছিল, এত আর কোন ধর্মই করে নাই। তন্ত্রের পর শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম অনেকটা কাজ করিয়াছিল। এখন সমাজে কোন ধর্মের প্রাবল্য নাই, আছে বিলাস ও একাকার বা নৈরাকারের প্রবৃত্তি। ইহার সাহায্যে Nation building বা বিরাট্ জাতির সৃষ্টি হয় না। আবার তন্ত্রকে জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে জাতির হিসাবে আমরা উন্নত হইতে পারিব না। ইহাই আমার বিশ্বাস।

বাঙলার তন্ত্র

ইংরেজী শিক্ষার অতিপ্রচারে, ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে আমরা আর যতই বিস্মৃত হই না কেন, দেশের এবং সমাজের দিকে দেশীয় দৃষ্টি লইয়া তাকাইতে ভুলিয়াছিলাম। ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে আমরা এতই আত্মহারা হইয়াছিলাম যে, দেশের পুরাতন আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি কিছুই ভাল বলিয়া বোধ হইত না; বিদেশের, বিশেষতঃ ইউরোপের সকল আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইত। আর এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতাম যে, ইউরোপের সামাজিক আচার ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত করিতে পারিলে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। এই মোহের ভার এতই অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে অনেকে এমন হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা দেশকে এবং বাঙ্গালী সমাজকে সাহেবী ঢঙ্গে পরিণত করিতে পারুন আর নাই পারুন, সমাজের দশ জনকে উন্নত উদাহরণ দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই কোরা সাহেব সাজিয়া বসিলেন। দেশের যাহা, দেশীয় যাহা তাহা কিছু কালের জন্য অবজ্ঞাত—উপেক্ষিত হইয়া রহিল। বঙ্গভঙ্গের পর, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশের সকল লোকের দৃষ্টি বাঙ্গালার পুরাতন সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইল, ইংরেজীনবীস বাবু খাঁটি বাঙ্গালীকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্বে যে কাহারও এদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। দেশপূজ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায়, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী পরিচালনায়, ইন্দ্রনাথের শ্লেষ

বিদ্রূপে, অক্ষয়চন্দ্রের সন্দর্ভে অনেকের দৃষ্টি এই দিকে নিপতিত হইয়াছিল বটে; পরন্তু তাঁহারা সাধারণ ইংরেজীনবীসের দল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে কেহ বা নব্য হিন্দু বলিয়া ঠাট্টা করিত, কেহ বা আর্য্যামি বলিয়া বিদ্রূপ করিত। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে এ ভাবটা অনেক কমিয়াছে—নাই বলিলেও চলে। এখন লোকে বুঝিয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এই দুই জনই বাঙ্গালার খাঁটি এবং স্বদেশী সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে পুরাদস্তর দেশীয়তার বেদীর উপর সমাজসংস্কারপদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাকী সব,— কেশবচন্দ্র হইতে সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইউরোপের নকলনবীস সমাজ-সংস্কারক এবং ধর্মপ্রচারক। তোমাদের দেশে, তোমাদের বাঙ্গালী সমাজে, খাঁটি বাঙ্গালী নাই কি? স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, যুবতীবিবাহ আছে, বিধবা-বিবাহ আছে, ছত্রিশ জাতি এক করিয়া পান ভোজনে একাকার আছে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাও আছে। তবে সে সব বাঙ্গালীর গাড়ু গামছার সঙ্গে, কাপড় চাদরের সঙ্গে, বেজায় ভার্ণাকুলার ভাবের সঙ্গে জড়ান মাখান আছে। সেখানে সেমিজ সেলুকা নাই। হ্যাট্ কোট নাই; রোষ্ট টোষ্ট নাই, কারি কট্‌লেট নাই, রুটি বিস্কুট নাই। আছে মালপোয়া, মালসাভোগ, মুদ্রা, মহাপ্রসাদ, খোল করতাল। সে সব খাঁটি বাঙ্গালার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম এবং বাঙ্গালার তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টা কর। গৌড়ীয় তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্মের সকল খবর পাইলে বুঝিবে. কেশবচন্দ্র হইতে শিবনাথ সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সবাই পণ্ড শ্রম করিয়াছেন; যাহা দেশে ছিল, তাহাই বিলাতী মোড়কে মুড়িয়া এ দেশে আবার আমদানি করা হইয়াছে।

আসল কথা কি জান, যে ধর্মের—যে সমাজবিন্যাসের উপর তোমাদের এতটা রাগ, এমন জাতক্রোধ, সে ধর্ম ও সমাজশাসন বাঙ্গালার সিকি অংশ লোকে মানিয়া চলে না। স্মৃতির আচারধর্ম এবং বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালায় কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে কতকটা নিবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ বাহ্যিক হিসাবে, কয়েকটা বহিরাবরণের হিসাবে স্মার্ত্ত ধর্ম এ দেশে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কারণ, যাঁহারা আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক বা দীক্ষিত বৈষ্ণব হইতেন, তাঁহারা স্মৃতির সকল হুকুম মানিতেন না। আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক, পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক চক্রে বসিতেন, সুরা পান করিতেন। স্মৃতির

হিসাবে তাঁহার জাতি ধর্ম থাকে কি? দীক্ষিত বৈষ্ণব মহোৎসবে প্রসাদ পাইলে, কীর্তনানন্দে বিভোর হইলে তাহার জাতি কুল স্মৃতির হিসাবে বজায় থাকে কি? বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ মাত্রেই হয় বৈষ্ণব, নহে ত ঘোর তান্ত্রিক। মনুর হিসাবে, এমন কি, রঘুনন্দনের হিসাবেও বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কাহারও ঠিকমত জাতি নাই। এখন ইংরেজের আমলে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া আমরা সর্বকর্মবর্জিত হইয়াছি; আমাদের চক্রে বসিয়া সুরা পান করা নাই, মহাপ্রসাদ বলিয়া মহামাংস ভোজন নাই, পক্ষান্তরে মহোৎসবে প্রসাদ ভোজন নাই, সহজিয়ার সাধনাও নাই। সে স্বেচ্ছাচারের স্থান এখন বিলাতী স্বেচ্ছাচার অধিকার করিয়াছে। চক্রের পরিবর্তে টেবিল হইয়াছে, অপরের পরিবর্তে ডিক্যাণ্টায় ও ওয়াইনগ্লাস হইয়াছে, মুদ্রার স্থানে রোষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে মালপোয়ার পরিবর্তে কেক খাই, পায়েস প্রসাদের পরিবর্তে পরিজ পান করিয়া থাকি। হেরিডিটি মানিতে হইলে বলিতে হইবে, বর্তমান স্বেচ্ছাচার আকাশ হইতে পড়ে নাই; খাঁটি দেশীয় স্বেচ্ছাচার ও একাকারের পরিবর্তে বিলাতী বা ইউরোপীয় স্বেচ্ছাচার স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গালার প্রায় পনের আনা নর নারী কখনই খাঁটি বৈদিক—বর্ণাশ্রমী হিন্দু ছিল না, এখনও নাই। কি জানি কেন, বাঙ্গালার মোলায়েম পলি মাটিতে বৈদিক হিন্দুয়ানি কখনই গজায় নাই, বোধ হয় কখনই ঠিকমত গজাইবে না। তাই মাঝে মাঝে বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানির চাষ করিতে হইয়াছে; কান্যকুব্জ, মিথিলা, কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে গোঁড়া হিন্দু আনিয়া হিন্দুয়ানির কলমের চারা সাজাইতে হইয়াছে; কিন্তু এমনই মাটির গুণ যে সেই গোঁড়া দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে পাতিতে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুও পাতি, মুসলমানও পাতি। বাঙ্গালার দেশীয়তার প্রভাব অপরিহার্য—অনিবার্য।

বাঙ্গালার বাঙ্গালীকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে, এই দেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং তন্ত্রের ধর্ম বুঝিতে হইবে। কারণ, বাঙ্গালী অর্ধেক বৈষ্ণব, অর্ধেক তান্ত্রিক। তন্ত্র-সাহিত্য পড়িয়া যত দূর বুঝা যায়, তাহাতে ইহা মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তন্ত্রধর্মই বাঙ্গালার আদিম ধর্ম। বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গালার ও তীরভুক্তির (আধুনিক ত্রিহুত ও মিথিলার) বৌদ্ধগণ মহাযান বৌদ্ধের প্রাবল্য ঘটান এবং সেই মহাযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে বজ্রযানী, কালচক্রযানী প্রভৃতি নানাবিধ তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত প্রচারিত হয়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম বাঙ্গালা হইতে

তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে, আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দূরদূরান্তর দেশে প্রচারিত হয়। পরে তিব্বত ও চীনের তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বাঙ্গালায় আসিতেন এবং তন্ত্রমত শিক্ষা করিতেন। এখন কথা এই যে, বৌদ্ধ তন্ত্রধর্ম অতিপুরাতন কোন মূল তান্ত্রিক ধর্মের বৌদ্ধ সমন্বয়, কি একেবারেই একটা নূতন ধর্ম, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। আমার মনে হয়, একটা অতি পুরাতন তন্ত্রধর্ম এ দেশে খুব প্রচলিত ছিল; বৌদ্ধ ধর্ম সেই ধর্মের সহিত মিশিয়া প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছিল। তন্ত্রের অধিকতর আলোচনা হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা পরে হইবে। যাহা হউক, ইহা ঠিক যে, গত দুই হাজার বৎসরকাল বাঙ্গালায় তন্ত্রধর্মই প্রবল আছে। এখন আমরা ধর্মকর্মশূন্য হইলেও তন্ত্রের আচার ছাড়ি নাই। বাঙ্গালার সকল বড় ভৌমিক ও জমিদারের ঘর তান্ত্রিক ছিল; পরে তাঁহাদের অনেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় যে, তান্ত্রিক ধর্মই বাঙ্গালার ধর্ম, তন্ত্র-সাহিত্যই বাঙ্গালার মূল সাহিত্য। বাঙ্গালার তন্ত্রধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্রের আচার এবং সিদ্ধান্ত যে অনেকটা মিলান এবং মিশান আছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলে তন্ত্রের পদ্ধতি অনেক পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সহিত আপোষ, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার Modern Buddhism গ্রন্থে এ কথাটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। সহজিয়া ধর্মে যে বৌদ্ধ ধর্মের গন্ধ বেজায় আছে, তাহা তিনিই জানেন, যিনি সহজিয়া এবং কর্তাভজাদিগের কর্মপদ্ধতি দেখিয়াছেন। বাঙ্গালার বাঙ্গালী চিরকালই নামে হিন্দু, কিন্তু কর্মে অর্ধেক বৌদ্ধ, অর্ধেক তান্ত্রিক। এই হিন্দু নাম বাঙ্গালীকে পাঠানগণ সর্বপ্রথমে দিয়াছিলেন, সেই হিন্দু নামের বন্ধনে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক এবং বর্ণাশ্রমাচারী হিন্দু সপণ্ডিত হইয়া এক জাতি এবং ধর্মাবলম্বীতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালায় এই তিন ধর্মের ফল্গু প্রবাহ চিরকালই বহিতেছে, বোধ হয় ভবিষ্যতে চিরকালই বহিবে। এইবার বুঝিতে হইবে, তান্ত্রিক ধর্মের মূল সিদ্ধান্ত কি? যে সকল সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত, সকল তন্ত্রগ্রন্থে গ্রাহ্য, আমি তাহারই কেবল উল্লেখ করিব।

তন্ত্র সাধনার ধর্ম, সমাজ-সংহতির ধর্ম নহে। প্রত্যেক সাধকের প্রকৃতি যোগ্যতা বুঝিয়া, তাহার জন্মকোষ্ঠী ও বংশগত ধাতু বুঝিয়া তাহার অধিকার নির্ণীত হয় এবং সেই অধিকার অনুসারে তাহার উপযোগী সাধন-পদ্ধতি

নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক সাধকের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্থির করা হয়।

তান্ত্রিক সাধনার কাল দিনের বেলা নির্দিষ্ট নহে। তান্ত্রিক পূজা পাঠ, ভজন সাধন, সবই রাত্রিকালে করিতে হয়। রাত্রির প্রথম প্রহরের পরে এবং অর্ধোদয় কাল পর্যন্ত তান্ত্রিক সাধনার প্রশস্ত সময়। দিনের বেলায় স্নান, দান ও নিত্যকর্ম ছাড়া সাধনাসম্পর্কিত কোন কাজ করিতে নাই। তবে সূর্যগ্রহণের সময়ে, বিশেষ কোন যোগ থাকিলে পুরশ্চরণ ও জপ করার বিধি আছে।

সাধক একা তন্ত্রসাধনা করিবে। তবে গোড়ায় গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া সাধনার পদ্ধতি বিহিত আছে। কেবল চক্রে বসিলে, এক অবস্থার বা একরকম যোগাভ্যাস ও এক গুরুর শিষ্যসকল এক সঙ্গে ক্রিয়া করিতে পারে। একান্ত নির্জন স্থান ছাড়া অন্য অন্য কোথাও তন্ত্র-সাধনা করা চলে না। তন্ত্র-সাধনা গোপনে করিতে হইবে; যত গোপনে করিতে পারিবে, ততই ভাল। তন্ত্রের স্পষ্ট উপদেশই আছে যে, গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ।

তন্ত্রের সাধনক্ষেত্রে জাতিবিচার বর্ণবিচার নাই। সিদ্ধির ন্যূনাধিক্য অনুসারে উচ্চ নীচ নির্ণীত হইয়া থাকে। তবে ব্রহ্মানন্দ গিরির ব্যবস্থা এই যে, গৃহী মাত্রেই ব্রাহ্মণ গুরু করিবে; গৃহস্থ, সাধক সন্ন্যাসী বা বিরক্ত পুরুষকে গুরুপদে বরণ করিবে না। কিন্তু এক গুরুর শিষ্যগণের মধ্যে জাতিবিচার নাই; সকল শিষ্যই সমানভাবে গুরুর প্রসাদে অধিকারী। মোটের উপর সাধন ব্যাপারে তন্ত্র জাতিবিচার করেন না।

তন্ত্র-বিধান-মতে শৈব বিবাহপদ্ধতি সকল জাতিই অবলম্বন করিতে পারে। এই শৈব বিবাহপদ্ধতি বশিষ্ঠ-সমন্বয়ের ফল। তন্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব কামরূপে তারা আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন; তাহার পর তিনি চীনে ও মহাচীনে পরিভ্রমণ করিতে যান। সে দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রচার করেন যে, নারী মাত্রই যখন আদ্যা শক্তির অংশরূপিণী, তখন নারীতে জাতিবিচার ও বর্ণবিচার করিতে নাই। যে নারীতে শক্তি যতটা স্ফুরিত, তিনি ততটা শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য। সুতরাং তান্ত্রিক সাধক, সকল জাতির এবং সকল দেশের নারী হইতে নিজ নিজ শক্তি (বা পত্নী) বাছিয়া লইতে পারেন। বিবাহের পূর্বে সে নারীকে পূর্ণাভিষিক্ত করিলে তাহার বীজগত সকল দোষ দূর হয়। পক্ষান্তরে চীন ও মহাচীনের তান্ত্রিকগণ ভারতবর্ষের আর্যনারীদিগকে

শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাকেই তান্ত্রিক পরিভাষায় বলে রাশিচক্র সমন্বয়। ইহা বহু পুরাতন সমন্বয়; কারণ, বৌদ্ধ মহাযানীয়ের গোড়ায় পুঁথিতে এই সমন্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায় ইহার পূর্ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সমন্বয় অনুসারে বাঙ্গালা দেশে রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্যন্ত শৈব বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই শৈব বিবাহপদ্ধতির প্রভাবে বাঙ্গালায় সর্বত্র অসবর্ণবিবাহ-রীতি প্রচলিত ছিল। ভেকধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে যেমন অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল, তান্ত্রিকদের মধ্যে তেমনই ইহার প্রাবল্য ছিল। তান্ত্রিকগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপর এক চাল চালিয়াছিলেন। মোগল, পাঠান, ইরানী, ইউনানী, চীনা, তিব্বতী, তাতারী—যে-কোন দেশের যে-কোন ধর্মালম্বী নারী হউক না, তন্ত্রের নির্দেশমত তাহাতে গোটাকয়েক লক্ষণ পরিস্ফুট থাকিলেই তান্ত্রিক সাধক তেমন নারীর সহিত শৈব বিবাহ করিতে পারিতেন।

তন্ত্র, সামাজিক ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী—সকল দেশের সকল ধর্মাবলম্বীই তান্ত্রিক সাধক হইতে পারেন। সমাজে ও সভায় মুসলমান মুসলমানই থাকিবে, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টানই থাকিবে, নিজ নিজ সমাজধর্মের কোন ব্যত্যয় ঘটাইবে না; অথচ সে অধিকারী হইলে, সদ্গুরু পাইলে তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষিত হইতে পারিবে। আমরা দুই চারিটি খুব উচ্চাঙ্গের মুসলমান তান্ত্রিক সাধককে দেখিয়াছি; এখনও দুই তিনটি শিক্ষিত ও পদস্থ মুসলমান তান্ত্রিকের খবর জানি। দরাব খাঁ, যাঁহার রচিত গঙ্গাস্তোত্র বাঙ্গালার বহু ব্রাহ্মণই নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। বড় বড় মুসলমান তান্ত্রিক শ্যামাবিষয়ক ভাল ভাল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক আধ জন খ্রীষ্টান তান্ত্রিকের খবরও আমরা পাইয়া থাকি।

তন্ত্রের দৃষ্টিতে কোন সামগ্রী অপবিত্র বা হেয় নাই। যাহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তাহা তাহার পক্ষে পবিত্র ও গ্রাহ্য। যে যাহা ভোজন করে বা ভোজন করিতে ভালবাসে, সে তাহাই তাহার ইষ্টদেবতাকে ভোগ দিতে পারে। মহাহোম বা যাগে পঞ্চ মহামাংসের মধ্যে গোমাংসও বৃহৎতন্ত্রসারে নির্দিষ্ট আছে। কোল, ভিল, সাঁওতাল মায়ের সম্মুখে মুর্গী এবং শূকর বলি দিয়া থাকে। তন্ত্র বলেন—সাধকের আত্মাই ইষ্ট; যিনি যে দেশের মানুষ, যাহার যেমন আচার-পদ্ধতি, তাহার ইষ্টদেবতারও সেই রকমের ভোগ যাগ

হইবে। তন্ত্র বলেন,—যে দেশের যেমন আচার, যেমন পান ভোজন প্রচলিত, সে দেশে যাইলে তেমনই আচার ও তেমনই পান ভোজন অবলম্বন করিলে কোন দোষ ঘটিবে না। বশিষ্ঠদেব মহাচীনে যাইয়া শূকরমাংস ভোজন করিয়াছিলেন।

'মন চঙ্গা ত কঠৌতী মে গঙ্গা'—হিন্দীর এই প্রবচনটা তন্ত্রেরই অনুবাদ মাত্র। তন্ত্র বলেন, তোমার যেখানে প্রবৃত্তি হইবে, সেইখানেই ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। শুইতে খাইতে, উঠিতে বসিতে, বলিতে ফিরিতে সদাসর্বদাই যখন হাতে কোন কাজ থাকিবে না, তখনই জপ করিবে। তবে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়; দেশভেদে সে পদ্ধতির অনেক পরিবর্তনও ঘটে। কিন্তু তান্ত্রিক উপাসনা, জপ ও মানস পূজা সর্বত্র, সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় চলিতে পারে। কেবল বিধিমত জপ করিতে হইলে নিশাকালেই করিতে হইবে। কারণ, নিশাকালই তন্ত্রসাধনার প্রশস্ত কাল।

ইহাই হইল তন্ত্রের মূল কয়টা কথা। ইহার পর উপাসনাতত্ত্বের কথা। সে কথার অনেক ইঙ্গিত পূর্বে বহু সন্দর্ভে করিয়াছি। পরে তাহার পুনরুল্লেখ করিব।

—শেষ—